৩০১। আপার লেখাপড়া

রুমা ক্লাস সিক্সে পড়ে। তার মত ছাত্রী আর হয় না। সে বিদ্যুৎ বেগে বই পড়ে। নড়ে না, চড়ে না, মুখ খোলে না, এক ঘন্টার মধ্যে একটা গল্পের বই শেষ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ধরে। সেদিন বাবার কাছে তার ক্লাসের বই কেনার টাকা চেয়েছিল। বাবা কোন উত্তর দেয়নি। এই বছরে জমিতে ধান হয়নি। কিছু টাকা জমা ছিল, তাও খরচ করতে হল। রাত্রে বাবা দুঃখ করে মাকে বলল, কি করি? তাদের খেতে দেব, না বই কিনে দেব? রুমার কিনতু ঘুম হয়নি। বাবার কথা শুনতে পেল। সেদিন থেকে রুমা আর টাকা চায়না, তবে দুই ঘন্টা দেরিতে স্কুল থেকে ফিরে আসে। সে নাকি এক বান্ধবীর সঙ্গে পড়াশুনা করে আসে। বাড়ি

এসে আবার বই নিয়ে বসে। দেখে,বাবা মায়ের মায়া হয়। এক মাস কেটে গেল। তার পরে বাবার অসুখ হল। বাড়িতে সবাই এক বেলা খায়। ছোট ভাই কাঁদে, ক্ষুধা তার সহ্য হয় না। তখন এক

দিন আপা ফিরে এল বড় একটা থলি নিয়ে। তাতে চাল, ডাল আটা, আরও অনেক কিছু। বলল, এই মাস টিউশনি করে বই কিনতে চেয়েছিলাম, আর হল না। কিন্তু তিন দিন পরে মামা এল। রুমার জ্ঞান-বুদ্ধি দেখে বলল, রুমা, তোমার মত মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করলে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন না। চল, বাজার থেকে বইগুলো কিনে আনি।

৩০২। আসল গোলাপ।

সোলেমান রাজার মত জ্ঞানী ইতিহাসে আর কেউ নেই। সে সময়ের সব বিদ্যা তার জানা ছিল। তার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ যে তার কাছে জটিল বলে কিছুই ছিল না। তার জ্ঞানের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল, অনেক দূর থেকে পন্ডিতেরা তার জ্ঞানের কথা শুনতে আসত। এক দিন শাবা দেশের রানী তাকে দেখতে এল। সেও ছিল খুব জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতি কিনতু অনেক জটিল সমস্যা নিজে সমাধান করতে পারত না। সেই সমস্যা লিখে নিয়ে রাজার কাছে আসল ।সোলেমান রাজা একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল। রাণী অবাক হয়ে রইল। রাজাকে অনেক দামী উপহার দিল। অবশেষে তার নিজের ব্যাগ থেকে দু'টি গোলাপ বের করে রাজার হাতে দিয়ে বলল, এই নিন, এই দুটি গোলাপের মধ্যে যেটা আসল সেটা রাখুন। যেটা নকল সেটা ফিরিয়ে দিন। সোলেমান রাজা আশ্চর্য হল। শিল্পী এত নিখুত কাজ করেছে যে দুটি গোলাপের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। বলল, আপনার দেশের শিল্পীরা অদ্ভুত কাজ করতে পারে... তারপর হঠাৎ রাজা জানালার দিকে তাকাল। তার দুই পাশে দুটি ফুলদানী ছিল। সেখানে গোলাপ দু'টি রেখে দিল, তারপরে বসে বসে দেখতে লাগল। একটা মৌমাছি এসে ডানদিকের গোলাপের উপর বসল। রাজা হাঁসল। সেটা তুলে নিয়ে বলল, এটা আমার গোলাপ।

৩০৩। বিনিময়।

১৯৩৯ সাল। জার্মান সেনাদল পোলেন্ড আক্রমন করে হাজার হাজার সৈন্যকে বন্দী করে ফেলল। তাদের সংখ্যা এত বেশী যে রাখার জায়গাও ছিল না, খাদ্যও তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। হুকুম এল, যাদের জন্য জায়গা নেই তাদের মেরে ফেলতে হবে।

বন্দীদের মধ্যে এক হাজার ইহুদী ছিল। তাদের জামায় একটা হলুদ রঙের তারা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হুকুম এল, এদের মেরে ফেলতে হবে সকলের আগে। তাদের মধ্যে দাউদ নামে একজন ছিল, সে তার স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ের কথা ভেবে শুধু চোখের পানি ফেলছিল। তারা না খেয়ে মরবে, এই ছিল তার ভয়। দাউদের এক বন্ধু ছিল, তার নাম মার্ক। সে ইহুদী নয়, তার জামায় সেই হলুদ রঙের তারা ছিল না। সে দাউদকে সান্তনা দিতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু সে প্রহরীদের ভাষা জানত। তাদের কথা শুনে জানতে পারল পরের দিন এই ব্যারাকের মধ্যে যে পঁচিশজন ইহুদী আছে তাদের হত্যা করা হবে। মার্ক ভাবল, আমি মরে গেলে একাই মরব, দাউদ মরে গেলে, সঙ্গে তার স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়েও মরবে...। রাত্রে দাউদের কাছে গিয়ে বলল, জামাটা খোল, আমারটা পর, সকালে প্রহরীরা তোমার নাম ডাকবে, তুমি উত্তর দিও না, আমি উত্তর দেব। মার্ক তার বন্ধুর জামাটা পরল। সকালে প্রহরীরা দাউদের নাম ডাকল। তার বদলে মার্ক উত্তর দিল এবং সেই পঁচিশজনের দলে মিশে গেল। দশ মিনিট পরে মেশিনগানের শব্দ শুনা গেল...। মার্ক আর ফিরে এল না।

৩০৪। ভুলুর প্রতিশোধ

ভুলু গরীব মানুষ। দোকানদার তাকে পাত্তা দেয় না, এক পয়সাও বাকি দেয় না। যাদের টাকা আছে তাদের খাতির করে, তাদের সালাম করে, তাদের চা-বিস্কুট খাওয়ায় ও তাদের বাকী দেয়। ভুলুর রাগ হয়। এক দিন ঠিক দোকানের সামনে ডাক পিয়ন তাকে একটা চিঠি দিল। আজ বিকালে তার মামা আসবে। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে হাউ মাউ করে কেঁদে বলতে লাগল, ও রে মামা গো! তুমি কেন মরলে গো! চাই না তোমার বিশ লাখ টাকা! কেন আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে মামা গো! চাই না তোমার টাকা, চাই না তোমার বিশ লাখ টাকা মামা গো!

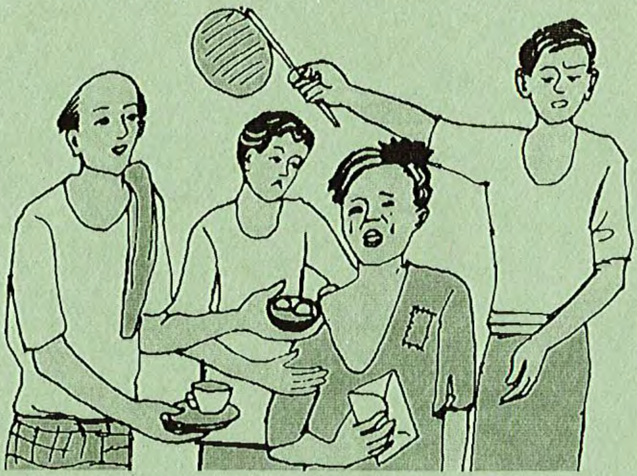

দোকানদার শুনে ছুটে এল, মহাজনরা ছুটে এল, ভুলুর মাথায় হাত বুলাল, বাতাস করল, চোখের পানি মুছে দিল, তাকে চা খাওয়াল, চম চম খাওয়াল, গাড়ীতে করে বাড়ি পৌছে দিল। এসে দেখে ভুলুর মামা বারান্দায় বসে আছে! দোকানদার অবাক, মহাজনরা অবাক! জিজ্ঞাসা করল, সে কি! আপনি মরেন নি?

- না তো! আমি মরতে যাব কেন?
- আপনি বিশ লাখ টাকা ভুলুর জন্য রেখে যান নি?
- না তো! আমি জীবনে এক হাজার টাকা দেখিনি, আর বিশ লাখ!

তারা অবাক হল, তারপর বুঝল। সবাই লজ্জায় পালিয়ে গেল। এদিকে ভুলু হেসে গড়িয়ে পড়ল।

৩০৫। ইলিশ মাছের ভাগাভাগি

পুই ও শিমকি এক বিরাট ইলিশ মাছ ধরেছে। তারা রাজার কাছে নিয়ে গেল। যখন পৌছে গেল শিমকি বেচারি আর পারছে না। দরজার সামনে বকু চৌকিদার বসে আছে। জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কেন এলে?

- এই মাছ রাজাকে উপহার দেব।
- নিয়ম নেই। রাজার জন্য আমরাই বাজার করি। আমি দরজা খুলতে পারি এক শর্তে, রাজার কাছ থেকে যা পাবে তার অর্ধেক আমাকে দিতে হবে।

পুইএর মুখ কালো হয়ে গেলঃ-কি করি শিমকি? দেব ?

- ঠিক আছে বকু, দেব। দরজা খোল।

কিন্তু দরজার ও পাশে আর একটা দরজা ছিল। সামনে লালু চৌকিদার। সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

- চৌকিদার সাহেব, দরজা খোল, রাজার কাছে যাব।
- মানে... দরজা তো খুলব... কিনতু আমি কি পাব ?
- রাজা আমাদের যা দেবে তুমি তার অর্ধেক পাবে, খোল।

শিমকি রাজার কাছে এসে বলল, মহারাজ, আপনার জন্য এই উপহার এনেছি, আমরা কিছু চাই না।

- সে কি! তোমাদের কিছু না দিয়ে এত সুন্দর মাছ নেব না।
- তাহলে বিশটা বেতের ঘা আমাদের দিতে বলুন।বকু তার অর্ধেক চেয়েছে আর লালু বাকি অর্ধেক। আপনি বিলি করে দিন। রাজা হাসতে হাসতে জল্লাদকে ডেকে বলল: তুমি ব্যবস্থা কর।

৩০৬। দু'টি চোর

ন্যায় ও শান্তি কেমন করে দেশে আনা যেতে পারে খলিফা সালাউদ্দিন তার একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখালেন। এক দিন রাজধানীর বড় বাজারে পাঁচশ টাকা চুরি করে এক যুবক ধরা পড়ল।

তাকে বেধেঁ আনা হল বিচারের খুঁটিতে। সেখান দিয়ে যত লোক যায় সবাই তাকে একটা করে বেতের ঘা দিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে খলিফা সালাউদ্দিন সেখান দিয়ে গেল। তখন যুবকটি মার খেতে খেতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। খলিফা জিজ্ঞাসা করল, কত চুরি করেছে? তারা বলল, পাচঁশ টাকা। কয়টা ঘা খেয়েছে? পঞ্চাশটা। ছেড়ে দাও। তখন লোকেরা আর একটা লোক খুটিতে এনে বাধঁল। তাকে ভদ্র লোকের মত দেখাচ্ছিল। খলিফা জিজ্ঞাসা করল, কি চুরি করেছে? প্রহরীরা বলল, সে

মাষ্টারী করে, সারা মাস শ্বশুর বাড়ি ছিল, মাসের শেষে পাঁচ হাজার টাকা মাইনা তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

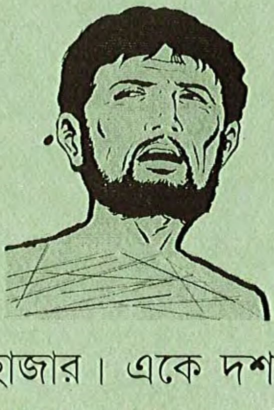

লোকটি পঞ্চাশটা বেতের ঘা খেয়ে খোড়াতে খোড়াতে চলে যাচ্ছিল। খলিফা বলল, ঐ যুবক চুরি করেছে পাঁচশ টাকা আর এই লোকটা পাঁচ হাজার। একে দশ গুন বেশী শাস্তি পেতে হবে। সারা বছর সে বাবা-মাদের হাতে অর্ধেক মাইনা ছেড়ে দেবে, তারা যেন ভাল শিক্ষককে নিযুক্ত করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে পারে।

৩০৭। গরীবদের সম্পদ

সেদিন রাত আটটায় সমবায়ের মিটিং হবার কথা। সাতজন চাষী অনেক আগে এসে বসল। তাদের মুখে হাসি নেই। এরা দিন মজুরী খাটে, আজ কোন কাজ পায়নি। চুপে চুপে হুক্কা টানতে লাগল। হঠাৎ রফিক বলে ফেলল, আচ্ছা, আমার বাগান জঙ্গলে ভরা, আমার ঘরের চাল দিয়ে আকাশ দেখা যায়, পাশের ডোবা থেকে মশা মাছি এসে রোগ ছড়াচ্ছে, পায়খানা ঘর শেষ হয় নি... আর দেখ, তোমরা সারাদিন বসে ছিলে তবু আমি তোমাদের বলতে পারিনি যে, ভাই, আমাকে সাহায্য করতে এস!... আজ তোমাদের এক দিনের কাজ নষ্ট হয়ে গেছে। মাসে পাঁচ টাকা জমা দিতে আমাদের কষ্ট হয়, আর এক দিনেই পাচঁশ টাকার কাজ নর্দমায় ফেলে দিই... রাগে বুক জ্বলে যায়!

সবাই অবাক। লালু বলল, এ ছাড়া আমাদের কি উপায় ছিল?

- কেন? তোমরা আমার বাড়িতে গিয়ে কাজ করতে পারতে!
- তাতে আমাদের কি লাভ? তুমি মজুরী দিতে পারতে?
- না, কিন্তু কাল তোমাদের ঘর মেরামত করতে পারতাম...

পরের দিন যত মজুর কাজ পায়নি সবাই রফিকের বাড়িতে কাজ করতে গেল, পরের দিন গেল লালুর বাড়িতে, তারপর ভুলু, আলমগীর, জলিল, আর আলীর বাড়িতে গেল। তিন মাসের ভিতরে মধুপুরের প্রত্যেকটি বাড়ি রাজবাড়ির মত পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন তারা তালতলার কুটুমদের দাওয়াত করল। এরা গত বছর বিয়ের জন্য মধুপুরে এসে গ্রামটার দুর্গন্ধ নিয়ে একটা গান বেদেঁছিল 'মধুপুরে যদি যাও - নাকে তুলো ভরে নাও'। এবার তারা গান তো দূরের কথা, বাঃ বাঃ করতে অজ্ঞান!

৩০৮। জমি

আলী আর সেলিম দুই ভাই, তাদের এক খানি করে জমি। আলীর তিনটি ছেলেমেয়ে। সে মজুরী খাটে, দিনে আনে দিনে খায়। আলী লেখাপড়া করতে পারেনি, কারণ বার বছর বয়সে তার বাবা মারা গেছে, ভাইবোনদের মানুষ করার জন্য মজুরী খাটা শুরু করেছে। সেলিম চাকুরী করে। সে বিয়ে করেছে এই ছয় মাস হল। তার বউ সব কাজে পাকা। এই ছ'মাসের মধ্যে জমিতে সব রকমের শাক-সব্জী লাগিয়ে তরকারীর অভাব মিটিয়েছে। স্বামীকে বাজে খরচ করতে দেয় না। তাদের সংসার বেশ সচ্ছল, কিছু টাকাও জমা আছে। অভাবের সময়ে আলী তাদের কাছে ধার নিয়েছে, শোধ করতে পারছে না। বউ বলে, আরও কিছু টাকা দিয়ে জমিটা লিখে নাও। সেলিম সে কথায় কান দেয় না। বউ কিনতু সারা বেলায় বক বক করে। সেলিম না কি কত টাকা ধার দিয়েছে, সে তার হিসাবও রাখে না । এক দিন আলীকে ডেকে সে বলল, চল, তোমাকে জমির দলিল নিয়ে শহরে যেতে হবে। যখন ফিরে আসল তখন তার ভাইপোকে ডাকল। তার বয়স দশ বছর। তার হাতে জমির দলিলটা দিয়ে বলল, এই নাও, বাপের জমি তোমার থাকল। তুমি বড় না হলে কেউ বেচতে পারবে না।বউ ভীষন ক্ষেপে গেল। বলল, হায় হায়, তোমাকে বিয়ে করে কি ভুল করেছি! সেলিম উত্তর দিল, মিয়া ভাই না হলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারতে না। আমি কবে মরে যেতাম! এই জমিটা ওদের প্রাণ, টাকা দিয়ে কি মানুষের প্রান কেনা যায়?

৩০৯। সুন্দরী মেয়ে।

আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়তাম তখন আমার দুজন বান্ধবী ছিল, সাকিলা ও রাবেয়া। আমাদের মধ্যে সাকিলা দেখতে সবচেয়ে সুন্দরী। সে ছিল বড় লোকের মেয়ে, যা ইচ্ছা তাই পেত। তার দশটা ভিন্ন রঙের জামা ছিল, সবগুলো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। চুল বাঁধতে প্রতিদিন তার আধা ঘন্টা লাগত। এ দিকে রাবেয়া আর আমি ভাই-বোনদের জ্বালায় কেবল চুল আচড়ানোর সময় পেতাম। সকালে তিনজনে মিলে স্কুলে যেতাম। সাকিলা আমাদের মাঝখানে মাথা উচু করে হাটত। সবাই তার দিকে তাকাত। নাচ গানেও সাকিলা ভাল ছিল, অনুষ্ঠান হলে সবাই তাকে হাততালি দিত। কিন্তু তার মেজাজ খুব গরম, সামান্য ব্যপার নিয়ে রাগ করে বসত। প্রতিদিন আমরা আলাপ করতে করতে আমার নানীর উঠানের উপর দিয়ে স্কুলে যেতাম। নানী হাসত, বসতে দিত ও পিঠা খাওয়াত। একদিন ছুটি হল, আমি ভাইয়ার হাত ধরে নানীর বাড়িতে গেলাম। নানী খুব খুশী। বলল, এস, আমরা তিনজনে মিলে পিঠা তৈরী করি, গরম গরম খাওয়া যাবে। পিঠা খেতে খেতে আমি বললাম, আমার বান্ধবী খুব সুন্দরী মেয়ে, তাই না, নানী? নানী বলল, লোকে তাকে সুন্দরী বলে কাপড়ের জন্য । তার মুখ বেশীদিন সুন্দরী থাকবে না, সুন্দরী হবার জন্য কিছু করে না। আমি অবাক! মানুষ কি ইচ্ছামত সুন্দর হয়?... নানী বলল, হয়। এই আয়নাটা দেখ। তুমি একটু হাস দেখি?। তোমাকে সুন্দর দেখায় না?...যদি হাস তোমার মুখ সুন্দর হয়। যদি রাগ করে থাক তোমার মুখ বিশ্রী হয়। বিশ্রী হতে হতে, বিশ্রী থেকে যায়। সাকিলার অবস্থা তাই হবে।

৩১০। ঝড় হবে !

আমাদের বাড়ি চট্টগ্রাম। বাবা-মা ও দুই ভাইবোন নিয়ে সেদিন এসে ছিলাম কুতুবদিয়ায়। কুতুবদিয়ায় আমার মামার বাড়ি। কুতুবদিয়া একটা দ্বীপ। সবাই তার নাম জানে, কারণ উনিশ একানববই সালে এক রাতে হঠাৎ তার চারিদিকে সমুদ্র ফুলে উঠেছিল ও হাজার হাজার মানুষকে ডুবিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার বিকালে বাড়ি ফিরে আসার কথা, কারণ, কালকে আমার দশ বছর বয়স পুর্ন হবে, বাবার সঙ্গে প্লেনে চড়ে ঢাকায় যাব। বাবা তো প্লেনের পাইলট। এটা হবে আমার জন্মদিনের উপহার। দুপুরের পর বাবা দুটো রিক্সা ঠিক করল। আমরা পাঁচজনে নানা- নানীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ঘাটে যেতে যেতে

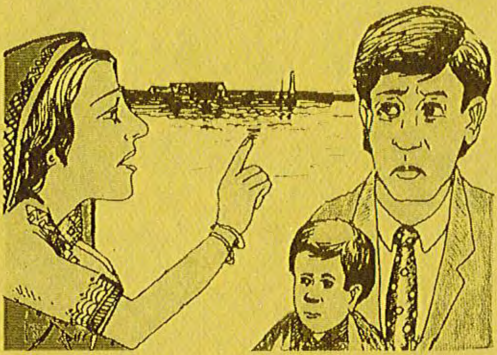

কয়টা সাদা মেঘ দেখা দিল, বাতাসের দিকটা পাল্‌টে গেল, খুব গরম পড়তে লাগল। হঠাৎ মা বলল, বাড়ি ফিরতে হবে। ঝড় হবে। বাবা বলল, রেডিওতে আবহাওয়ার খবর শুনলাম, কোন সতর্কবাণী নেই। মা বলল, আমি এখানকার মেয়ে, আমি সমুদ্রের কথা বুঝি, ঝড় হবে! বাবা বলল, কাল ছেলেটার ঢাকা যাওয়ার দিন। সব মাটি হয়ে যাবে!

- মাটি হয়ে যাবে যাক! ঢাকায় আর এক দিন যাবে।
- ঐ দেখ, লঞ্চ চলে যাচ্ছে, চল, ওদের জিজ্ঞেস করে দেখি।
- জিজ্ঞেস করা লাগবে না, ঝড় হবে! শোন, আমি ঐ ছোট লঞ্চে উঠব না, ছেলেমেয়েদেরও উঠতে দেব না! বাবার মুখে রাগ, শেষে কিনতু ফিরে যেতে হল। রাত হয়ে গেল। আটটার সময় রেডিওতে খবর শুনলাম। লঞ্চটা ৫০জন যাত্রীকে নিয়ে ডুবে গিয়েছে।

৩১১। রাজার কাছে চিঠি।

এক দিন চট্টগ্রামের পোষ্ট অফিসে কর্মচারীরা চিঠির বাক্সটা খুলে একটা খাম পেল এই ঠিকানা নিয়েঃ বাংলাদেশের রাজা পাবে। চিঠিটা খুলে পড়লঃ- মহারাজ আশা করি ভাল আছেন। আমরা কিনতু ভাল নেই। আজ তিন মাস হল আব্বা মারা গিয়েছে। আমরা তিনজনই ছোট, স্কুলে পড়ি, মা পরের বাড়িতে কাজ করে। যা পায় তাতে আমাদের খাওয়া চলে না, বার বার আমাদের উপোষ থাকতে হয়। তাই দয়া করে পাঁচশ টাকা আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। ইতি, ফিরজ, ১৭ পাহাড়তলী রোড। চোট্টগ্রাম।

কেউ হাসল না। পোষ্টমাষ্টার পকেটে হাত দিয়ে পিয়নকে বলল, এই নাও আমার টাকা, পঞ্চাশ টাকা করে চাঁদা তুলে ওদের কাছে চারশ টাকা পৌছিয়ে দিয়ে এস। পরের দিন কিন্তু বাক্সে আর একটা চিঠি ছিল। ঠিকানাটা আগের মত। কর্মচারীরা সবাই মিলে পড়তে লাগলঃ- মহারাজ, আপনি কেমন আছেন? আমরা আগের চেয়ে অনেক ভাল। গত রাত্রে সবাই পেট ভরে খেয়েছি, আমরা কৃতজ্ঞ। তবে আগামী বার যখন টাকা দেবেন তখন দয়া করে নিজে এসে দিয়ে যাবেন। আপনার পিয়ন কাজের বাবদে একশ টাকা কেটে নিয়েছে।ইতি, ফিরজ।" এবার সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ল।

৩১২। খাড়া ডিম।

১৪৯২ সালে সবাই জানত এই পৃথিবী গোলাকার, সুতরাং ইউরোপ থেকে ইন্ডিয়ায় যেমন পুর্ব দিক দিয়েও যাওয়া যায়, পশ্চিম দিক দিয়েও যাওয়া যায়। এতদিন কিন্তু পশ্চিম দিক দিয়ে কেউ যায়নি। একদিন কলোম্বাস নামে এক দুঃসাহসী নাবিক তিনটে ছোট জাহাজ নিয়ে সেই পথ ধরল। ইন্ডিয়ায় পৌছাবার আগে সে আবিষ্কার করল এক বিরাট দেশ, তার নাম আমেরিকা। কলোম্বাস ফিরে এসে এই খবর দিল এবং কয়েক বছর পরে মানুষ সেই পথ ধরে ইন্ডিয়ায় পৌছে গেল। সেই সময় একদিন কলোম্বাস এক হোটেলে বসে তার যাত্রার কথা আলোচনা করছিল। তখন একজন পন্ডিত জোর গলায় বলল, আপনি যা করেছেন তা সবাই করতে পারে।পৃথিবী গোলাকার, তাহলে দুই দিক দিয়ে ইন্ডিয়ায় যাওয়া যায়, এই কথা সবাই বোঝে।কলোম্বাসের থালায় একটা সিদ্ধ ডিম ছিল। সে লোকটার

হাতে ডিমটা দিয়ে বলল, এটা খাড়া করে বসিয়ে দিন তো। তাদের চারিদিকে লোকেরা জড়ো হয়ে গেল। পন্ডিত অনেক চেষ্টা করে বলল, একটা ডিম কি খাড়া থাকে? অসম্ভব! কলোম্বাস ডিমটা নিয়ে টেবিলের উপরে একটা ধাক্কা দিল। ডিমটা খাড়া হয়ে রইল। সবাই হাসল। তখন কলোম্বাস আর একটা ডিম দশ বছরের একটা ছেলেকে দিয়ে বলল, দেখি তুমি পার কি না? ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ডিমটা খাড়া করে বসিয়ে দিল। তখন কলোম্বাস পন্ডিতকে বলল, এই দেখুন পন্ডিত সাহেব, এখন সবাই পারে, কিন্তু প্রথম বার আপনার মত পন্ডিত মানুষও পারলেন না। প্রথম বার হল আসল!

৩১৩। মোস্তাফা কামাল

যারা আমাদের দেশ স্বাধীন করার জন্য অস্ত্র ধরেছিল তাদের মধ্যে মোস্তাফা কামালের কথা কেউ ভুলবে না। তিন দিক থেকে সত্রুরা তার ছোট দল ঘিরে ফেলেছিল। এমন বিপদে এর আগে তারা কোন দিন পড়েনি। তাদের অনেকের জন্য এটা ছিল প্রথম লড়াই। তাদের সকলের মুখে এক কথা, আজ রক্ষা নেই, লড়াই করলেও মরব, পালিয়ে গেলেও মরব। হঠাৎ কামাল বলল, সবাই মরতে যাব কেন? মেশিনগানটা ও গুলির বাক্স রেখে যাও। ওরা যাতে তোমাদের পিছু না ধরে, সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। যাও তোমরা, চলে যাও। কামাল একা গর্তের ভিতরে শুয়ে পড়ল। সে তিন দিকে অবিরত গুলি ছুড়তে লাগল, আর তিন দিক থেকে অবিরত গুলি আসতে লাগল। শত শত গুলি। বেশ কয়টা তার গায়ে লাগল, তবু যতক্ষণ তার কাছে গুলি রইল ততক্ষণ কামাল শত্রুদের মনোযোগ তার দিকে আকর্ষন করতে লাগল যাতে তার বন্ধুরা ফাঁদ থেকে বের হওয়ার সময় পায়। তারপরে এক সময় হঠাৎ কামালের মেশিনগান থেমে গেল। তখন শত্রুরা খুব সাবধানে এগিয়ে এল। কাছে এসে দেখল গর্তের ভিতরে আছে শুধু ক্ষত বিক্ষত একটি যুবকের দেহ। তার নাম মোস্তাফা কামাল। সে প্রান দিয়ে তার বন্ধুদের বাঁচিয়ে রেখেছিল।

৩১৪। দান

১৯৪৫ সাল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জারমান দেশের লোকেরা অভাবে ও দুর্ভিক্ষে দিন কাটাচ্ছিল। তবে স্কুল রীতিমত চলছিল।তখন আমি সেখানে ছিলাম। এক দিন এক বন্ধুর বাড়িতে দাওয়াত পেলাম। রাত্রে তার সঙ্গে ভাত খেলাম, সকালে সে বলল, ভাই, সকাল আটটা থেকে দুটো পর্যন্ত আমি মাষ্টারী করি। আমার ক্লাস দেখবে? আমি খুশি হয়ে বললাম, দেখব। আমার বন্ধু ক্লাস ফোর পড়াত। সবাই ছিল গরীব পরিবারের ছেলেমেয়ে, তাদের জামা-কাপড় দেখে বুঝা যাচ্ছিল। আড়াই ঘন্টা স্কুল চলল। এক সময় শিক্ষক তাদের চোখ আকর্ষণ করল দেয়ালের দিকে। সেখানে একটা রুগ্ন শিশুর ছবি টাঙ্গানো ছিল, নিচে লেখা ছিলঃ- ভাই, এই জগত শুধু তোমার নয়, আমারও, এস আমরা তা ন্যয্য ভাবে ভাগ করে নিই। শিক্ষক বলল, তার অর্থ কি, বলতে পার? একটা মেয়ে পরিষ্কার উত্তর দিল,একটা শিশু যদি খাদ্যও শিক্ষা না পায়, তবে এটা অন্যায়।আর একজন বলল,এটা সবার দোষ, আমাদের ও। বসে বসে দেখলে চলবে না, কিছু করতে হয়। হঠাৎ টিফিনের ঘন্টা বাজল। সবাই বাইরে গেল। দরজার পাশে একটা বাক্স ছিল। বের হবার সময় সবাই পকেটে হাত দিয়ে সেই বাক্সে কিছু টাকা দিয়ে গেল। আমার বন্ধুও, বাক্সে তার দান রেখে আমাকে বলল, এই মাস আমাদের রোজা,প্রতিদিন

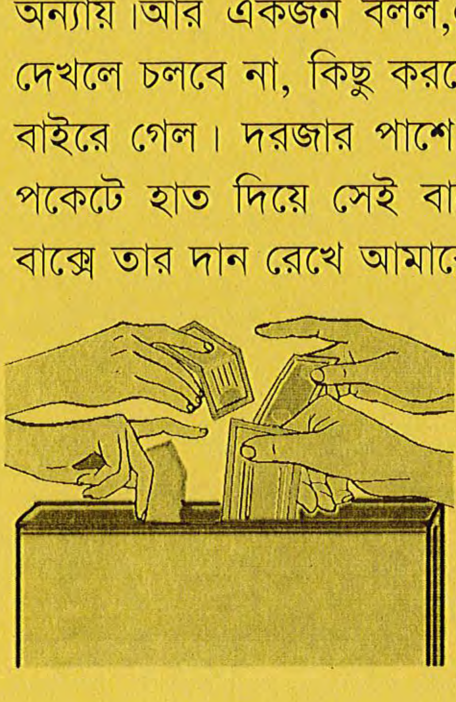

আমরা কিছু দান করি। তুমি দেশে ফিরে গিয়ে বল যে, এই মাসে আমাদের ছেলে মেয়েরা টিফিনের টাকা দান করেছে, যাতে তোমাদের সরকার শিশুদের বই ছাপাতে পারে ও শিক্ষকদের মাইনা দিতে পারে। ভাবলাম, বাঃ একে বলে রোজা!

৩১৫। টোকাই

শাহীন ফুটপাথে বসে ছিল। বাবুলকে স্কুলে যেতে দেখে বলল,

- ভাই, তুমি তো সব সময় এই পথ দিয়ে যাও, তোমার নাম কি?
- আমার নাম বাবুল, কেন?
- দু' টাকা আছে? কালকে ফিরিয়ে দেব।
- নাও, ফিরিয়ে দিতে হবে না।
- তাহলে নেব না। আমি ভিক্ষা করি না।
- আচ্ছা, কালকে দিও।তোমার নাম কি?
- আমার নাম শাহীন। এই রাস্তার সবাই আমাকে চেনে। যদি তোমার কোন দরকার হয় এই সময় আমাকে এই মোড়ে পাবে।
- কি কর? স্কুলে যাও না? আমাকে প্রতিদিন যেতে হয়।
- সে অনেক কথা। এক সময় বলব। এখন তোমার সময় নেই। পরের দিন শুক্রুবার। শাহীন সেই মোড়ে বসে ছিল, তখন বাবুল আসল। শাহীন বলল, এই নাও তোমার দু' টাকা। চল, আজ তোমার ছুটির দিন, আমার কাজ দেখে যাও। দেখ, ঐ দোকানে বেলাল সাইকেল-রিক্সা মেরামত করে। আমি তার সঙ্গে কাজ করি। একটা টিউব ঠিক করলে দুই টাকা পাই। শাহীন দ্রুত কাজ শুরু করল। তার হাত যাদুকরের হাতের মত নাড়াচাড়া করছিল। তিন বছর এই কাজ করতে করতে সে মালিকের চেয়ে পটু হয়ে গেছে। বাবুল হা করে তাকায়। শাহীন বলে, কি দেখছ বসে বসে? বরং ঐ টায়ারটা খোল। বাবুল বলে, ঐ সব আমি পারি না।

- আমিও দুই বছর আগে পারতাম না, দেখতে দেখতে

শিখেছি। দুই ঘন্টা পরে বাবুল গর্বের সঙ্গে বলল, দেখ, এই টায়ার একা একা খুলে ফেলেছি!... কিন্তু... আমার খুব খিদে পেয়েছে।

তারা পাশের একটা ঝোপড়ি হোটেলে পাঁচ টাকার ডাল-ভাত খেল। তারপর বাবুল বলল, এবার চল তোমাদের বাড়ি যাই।

তারা আধ ঘন্টা হেঁটে গিয়ে শহরের বাইরে এক বিরাট বটগাছের তলে পৌছল। সেখানে তিনটি ছেলে বসা ছিল। শাহীন বলল, এরা আমার বন্ধু, তাদের বাবাও নেই, মাও নেই, আমার মত। আমরা এই বাড়িতে থাকি, দেখতে চাও তো উঠে এস। এই বলে শাহীন বটগাছের একটা লতা ধরে কাঠবিড়ালের মত গাছে উঠল। বাবুল বলল, আসব কেমনই? আমি উঠতে জানি না। ছেলেরা সবাই হাসল।

- কি করতে পার তাহলে? ডাংগুলি খেলতে পার? হা-ডু-ডু খেলতে পার? বাঁশী বাজাতে পার? বাবুল বলল, না।

- সবাই হাসছিল। বাবুল অনেক্ষণ চুপ করল। শেষে বলল। আমি বই পড়তে পারি। সকলের হাসি থেমে গেল। শাহীন গাছ থেকে নেমে এল। বলল, বাবুল, আমরা তোমাকে সব শিখাব, সাইকেল ঠিক করতে, গাছে উঠতে বাঁশী বাজাতে, ডাংগুলি খেলতে... তুমি আমাদের বই পড়া শিখাও। বাবুল বলল, ঠিক আছে, বই নিয়ে আসি। সেদিন থেকে সবাই বাবুলের কাছে বই পড়া শিখতে লাগল।

নয় মাস পরে এক দিন চেয়ারম্যান সাহেব হেডমাষ্টারকে বলল, আমার ছেলে এই বছর খুব উন্নতি করেছে, কাকে ধন্যবাদ দেব? হেডমাষ্টার বলল, আমাকে নয়। দেখুন, ঐ ছেলের নাম শাহীন, সে বাবুলকে জীবিত করে তুলেছে।

৩১৬। নুতন সরকার

দুটি ভাইবোন ছিল, ভাইএর নাম বাবুল, বোনের নাম মালা। তারা ক্লাস ফোরে পড়ত। তারা গল্প এত ভালবাসত যে প্রত্যেক দিন একটা গল্প না শুনলে তাদের ঘুম হত না। স্কুলে গিয়ে যতক্ষণ আপা তার গল্প না বলত তাকে ছাড়ত না। আজ সকালে আপা মালাকে বিজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করল। মালা বলল, আপা, এই পাঠ আপনি স্কুলে পড়ান নি। বাড়িতে আমি আপনার কাজ করার সময় পাইনা, মায়ের জন্য কাঠ কুড়াতে হয়, দাদীর বকুনি খেতে হয়, বাবুলের সঙ্গে খেলা করতে হয়, আর গল্প তো পড়তেই হয়, তাই আমি বিজ্ঞান পড়িনি। আমি কিন্তু রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি, বলব?

সব ছেলেমেয়েরা হাততালি দিল। মালা শুরু করলঃ- বাবুল আর আমি বটগাছের তলে গল্প পড়ছিলাম। হঠাৎ পরী, আমার এক নান্ধবী এসে বলল, সরকার পদত্যাগ করেছে। আগামী চার বছর ছেলেমেয়েরা দেশ চালাবে। তোমরা বেছে নাও কিসের মন্ত্রী হতে চাও। বাবুল বলল, আমি শিক্ষামন্ত্রী হব, ছেলেমেয়েদের মজা হবে, দিনে তিনটে করে গল্প শুনতে পাবে। আমি বললাম, বেশ, আমি খাদ্যমন্ত্রী হব, তাহলে ছেলে মেয়েরা দিনে তিনটে করে রসগোললা খেতে পারবে আর কেউ না খেয়ে থাকবে না। পরী বলল, ঠিক আছে , আমি তাহলে প্রধান মন্ত্রী হব। শুরু করা যাক। শিক্ষা মন্ত্রী, তোমার আইন জারি করে দাও। বাবুল বলল, না, আমি একা করব কেন? অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতামত নিতে হবে। প্রত্যেক স্কুল থেকে একজন করে ছাত্র আমার কাছে পাঠাতে হবে। পরের দিন তারা বাসে চড়ে ঢাকা পৌছে গেল।বাবুল তাদের জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কি নালিশ আছে

বল। সবাই চিৎকার করে বলল, বাড়িতে আমাদের অনেক কাজ, আমাদের খেলতে হয়, কাঠ কুড়াতে হয়, বাবার সঙ্গে জমি চাষ করতে হয়, রান্না শিখতে হয়, ছোটদের দেখতে হয়, গল্প পড়তে হয়, আরও কত কি। আমরা স্কুলের বই স্কুলেই পড়ব। স্যার যদি ঠিক সময়ে স্কুলে আসে ও ক্লাসের সময়ে অফিসে না ঘুমায়, আমরা স্কুলে বসে সব শিখতে পারব। বাড়িতে আমরা স্যারের কাজ করতে যাব কেন? এই আইন কর, স্যার যেন বাড়িতে স্কুলের বই আনতে না বলে, আমরা শুধু গল্পের বই পড়ব। আর আমরা যদি পরীক্ষায় ফেল করি, সেটা মাষ্টারের দোষ, তাই স্যার মাষ্টারী করা ছেড়ে দেবে, এই আইন চালু কর। এবার আমি খাদ্য মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের কি নালিশ আছে? সব ছেলেমেয়েদের একই মতঃ- তাদের অনেকে রীতিমত ভাত খেতে পায় না, পেয়ারা, আম, জাম, লিচু, পিঠা, রসগোল্লা খেতে হলে পাশের বাড়ি থেকে চুরি করে খেতে হয়, আর কান মলাও খেতে হয়। এ তো বড় অন্যায়। যেকোন সভ্য দেশে ছেলেমেয়েদের পেয়ারা খাওয়ার অধিকার আছে, আর রসগোল্লা তো বটে...। তাই আমি ভেবে চিন্তে এই আইন করে ফেললামঃ- প্রত্যেক বাড়িতে একটা শিশুর জন্ম হলে এই কয়টা গাছ লাগাতে হবে, দুটো পেয়ারা গাছ, একটা আম গাছ, একটা লিচু গাছ, একটা পিঠার গাছ আর দুটো রসগোল্লার গাছ। উপরন্ত কোন ছেলেমেয়ের যদি খিদে লাগে, যেকোন রান্নাঘরে গিয়ে সে ভাত খেতে পারবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি পরী বুবুর সঙ্গে এই আইনটা লিখে, সীল মেরে সই দিলাম। তখন সব ছেলেমেয়েরা আনন্দ-উল্লাসে এত হৈ চৈ করতে লাগল যে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, তাই নুতন আইনটা এখনও চালু করতে পারিনি। তবে ভাবনা নেই... এক দিন চালু হবে!

৩১৭। চাচীর দই

ঈদের পরের দিন। সকালে এক হাড়ি দই এনেছি। সবাই মজা করে খাচ্ছে, শুধু আমার মজা লাগে না।

- আব্বা, তুমি দই খাবে না?
- এই তো খেলাম। তোমরা আমার ভাগ খেয়ে নাও। আমি এক বার মধুপুর গিয়ে বড় চাচীর সঙ্গে দেখা করে আসি, তার সঙ্গে গত ২৫ বছর ধরে আমার দেখা হয় নি।
- ২৫ বছর! এতদিন পরে মনে পড়ল কেন?
- তার কাছে আমার একটা ঋণ আছে, আমি শোধ করে আসব।

বাসে চড়ে, আধ ঘন্টা হেঁটে, দুপুরে এসে পৌছলাম।

গ্রামটা পুরোপুরি বদলে গেছে, আমি ঘরটা খুজে পাচ্ছি না। এক চায়ের দোকানে কজন লোক বসা ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সলিল মিয়ার বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? তার স্ত্রী ফাতেমা আমার আপন চাচী। তাদের সকলের চোখ উজ্জল হয়ে গেল। এক স্বরে উত্তর দিল, ফাতি বুবুর কথা বলছেন? কে তার বাড়িতে দই খায়নি জিজ্ঞাসা করুন!

আমার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। আমিও পঁচিশ বছর আগে দইএর লোভে চাচীদের বাড়ি যেতাম। আর যেতাম তার আদর পাওয়ার জন্য বটে!

পঁচিশ বছর পরেও চাচী আমাকে চিনে ফেলল। সে হাসল, সে কাঁদল,

সে আমাদের বাড়ির প্রত্যেকের খবর নিল। সব খুটিনাটি জানবার জন্য তার আধ ঘন্টা সময় লেগে গেল। তারপর... তার দই নিয়ে আসল। যে দইএর মত দই গ্রামে কেউ তৈরী করতে জানে না, সেই দই। কারণ মায়া ও ভালবাসা ছাড়া ভাল দই হয় না।

দই খেয়ে আমি পকেটে হাত দিলাম। বহু পুরানো একটা ছোট মানিব্যাগ বার করে তার হাতে গুঁজে দিলাম। বললাম,

চাচী, তোমার কাছে আমার একটা ঋণ আছে, আমি তা শোধ করতে এলাম। পঁচিশ বছর আগে তোমার বাক্স থেকে এই মানিব্যাগ নিয়েছিলাম। চাচী বলল, জানি, ভিতরে একটা টাকা ছিল।

- সে কি! তুমি তা হলে সব জানতে! এই পঁচিশ বছর কিছু বলনি!
- ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করবেই!... তা ছাড়া আমি জানতাম তুমি ধার নিয়েছ, একদিন তা শোধ করে দেবে...

চাচী হাসল। ব্যাগটা খুলে দেখল, এক হাজার টাকা!

- সুদে আসলে এক হাজার টাকা হয়েছে বুঝি?
- হিসাবে তাই হয়েছে।
- আচ্ছা বাবা, তুমি আমার সেই এক টাকা ফিরিয়ে দাও, তোমার কাছ থেকে সুদ নিতে পারব না।
- না চাচী, এটা তোমার পাওনা, আমার ঋণ শোধ করতে চাই।

চাচী প্রান খুলে হাসল। তোমার ঋণ! না বাবা। তোমার ঋণ শোধ করতে হলে আমার দইএর দামও দিতে হবে। তার জন্য কি তোমার টাকায় কুলাবে?.... আমার মুখে আর কথা উঠল না। চাচীর দইএর দাম দিতে হলে আমার টাকায় কুলাবে না বটে... এক লাখ টাকা দিলেও ঋনটা শোধ হবে না।

৩১৮। অন্ধ মিস্ত্রী

লিটন জীবনে কোন দিন পরীক্ষায় ফেল করেনি, এবার, বিশ বছর বয়সে ফেল করেছে। সকালে তার পরীক্ষার ফল দেখে সে কলেজ থেকে একটা চোরের মত পালিয়ে এসেছে, তারপরে বাবার সাইকেলে চড়ে বড় রাস্তায় উঠে গ্রামের দিকে দ্রুত বেগে চালাতে লাগল, কেউ যেন জিজ্ঞাসা করতে না পারে, লিটন, পাস করেছ?... মনে মনে কে যেন তাকে বলতে থাকে, লিটন তুমি আস্ত গাধা, তোমার দ্বারা জীবনে কারও উপকার হবে না... তারপর কখন সন্ধ্যা হয়ে গেল, কখন বৃষ্টি শুরু হয়ে সে একটা মাছের মত ভিজে গেল তা জানতে পারল না। হঠাৎ সাইকেল থেমে গেল, সে আর ঠেলতে পারছে না। সামনের চাকা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। লিক না সারলে সাইকেলটা চালানো যাবে না। কাছে কোন গ্রাম নেই, সাইকেলের দোকান তো দূরের কথা। আর বৃষ্টি তো থামছেই না। লিটনের চোখে পানি আসল। সাইকেলটা ঘুরিয়ে টাউনের দিকে ঠেলে ভাবতে লাগল, ফিরতে কতক্ষন লাগবে? চার ঘন্টা? পাঁচ ঘন্টা? জীবনে সে কোন দিন এত ক্লান্ত হয়নি...। হঠাৎ রাস্তার বাঁ দিকে দুশ-তিনশ মিটার দুরে একটা কুড়ে ঘরের বারান্দায় বাতি জ্বলে উঠল। লিটন ভাবল, আমি ক্লান্তিতে মরে যাচ্ছি, ওরা হয়তো বসতে বলবে। রাস্তা থেকে নেমে, সাইকেল টানতে টানতে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। বারান্দায় আট-দশ বছরের একটা মেয়ে মন দিয়ে পাঁচ গুটি খেলছিল। সাইকেলের চাকা দেখে বলল, সালাম চাচা, আপনি বসুন, আমি দাদাকে ডেকে আনি আর যন্ত্রপাতি নিয়ে আসি। আপনার ভাগ্য ভাল, আমার দাদা এক সময় সাইকেল মেরামৎ করত। কিনতু আপনার কাপড় ভেজা যে?... মেয়েটা ঘরে গেল। ফিরে আসল দাদাকে নিয়ে।

সে লিটনকে বলল, সাইকেল বারান্দায় তোল। তারপর এই লুঙ্গিটা পরে কাপড় ছাড়, আমার নাতনি আগুনের কাছে শুকিয়ে দেবে। আমি তোমার সাইকেলটা দেখব। বুড়ো লোকটি ধীরে ধীরে সাইকেলের টিউব বের করে লিক সারল। তার বেশ সময় লাগল। যখন কাজ শেষ হল তখন লিটনের শার্ট-প্যান্ট শুকিয়ে গিয়েছিল। তার হাতে বিশ টাকা ছিল। তা বের করে বুড়ো লোকটাকে বলল, বড় উপকার করেছেন, এই নিন। বুড়ো লোকটি হাসল। নাতনি বলল, দাদা দেখতে পায় না, দাদা অন্ধ। দাদা আপনার টাকা নেবে না। লিটন অবাক। কাপড় পরে সাইকেলে চড়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। তার মনের নিরাশা হঠাৎ চলে গিয়েছে । এই বুড়ো অন্ধ লোকটি তার সাইকেল মেরামত করে এক পয়সাও নিতে চায়নি। সে অন্ধ হয়েও উপকার করেছে। সে বলেনি, আমার কোন দাম নেই...। লিটন বাড়ি পৌছে গেল রাত দশটায়। এতক্ষণ বাবা-মা খুব ভয় পেয়েছিল। তারা পরের মুখে শুনেছে লিটন পরীক্ষায় ফেল করেছে। রাগে, দুঃখে, সে কি করবে তার কোন ঠিক নেই... এবার তারা নিশ্বাস ছাড়ল। লিটন ঘরে এসে বলল, মা, আমার খিদে পেয়েছে। খেতে খেতে বলল, বাবা, আগামী বছর আমার পাশ করতে কোন কষ্ট হবে না। এরই মধ্যে একটা কাজ করব, আমাদের প্রাইমারী স্কুল অচল হয়ে যাচ্ছে। ক্লাস ওয়ানে আশিজন ছেলেমেয়ে পড়ে। আমি ক্লাসটা ভাগ করতে বলব, অর্ধেকটা আমি পড়াব, অর্ধেকটা পড়াবে সরকারী মাষ্টার, তাতে পুরোটা স্কুল জীবিত হয়ে উঠবে, দেখে নিও! বাবা-মায়ের মুখে এতক্ষণ হাঁসি ফুটল।

৩১৯। প্রতিশোধ

তালতলা গ্রামে দু'জন বন্ধু আছে, মৌলানা সাহেব আর হিন্দু পাড়ার কামিনি ব্রাম্মন। গ্রামের সবাই তাদের সম্মান করে। বিচার শালিস তারাই করে। দুর্ভিক্ষ হলে একসঙ্গে দুঃখ করে, উৎসব হলে পরস্পরকে দাওয়াত করে। কিন্তু এই বছর দুঃখের মাত্রা খুব বেশী হচ্ছে। বিলের পানি দ্রুত বেড়ে গিয়ে ধান ডুবিয়ে দিয়েছে। সকলের মনে রাগ। তাই যেদিন রেডিওতে শুনল ভারতের হিন্দুরা এক মসজিদে আগুন লাগিয়েছে, তখন দুই পাড়ার মধ্যে গন্ডগোল বাধল। মাদ্রাসার ছাত্ররা বাড়ী বাড়ী গিয়ে লোক ডাকল। আধা ঘন্টার মধ্যে দু'শ লোক মৌলানা সাহেবের বাড়ীতে হাজির হল। তাদের হাতে শাবল, কুড়াল, বেলছা, হাতুড়ী ও ঘর ভাঙ্গার সরঞ্জাম। মৌলানা সাহেব বিরক্ত হল। বলল বেশ, চল আমরা ভারতে গিয়ে তাদের শাস্তি দিয়ে আসি, কি বল? সবাই অনেক্ষণ চুপ করে রইল। শেষে ক্লাস টেনের এক ছাত্র জোর গলায় বলল, হিন্দুরা আমাদের মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছে, আমরা তাদের মন্দির ভেঙ্গে ফেলব! মৌলানা সাহেব গম্ভীর হয়ে

বলল, বেশ, আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি। তবে ধর্মের বিধান মানতে হবে। এই, ছেলেরা! তোমরা কি পড়নি, মুখে এক ইঞ্চি দাড়ি না উঠলে যুদ্ধ করা হারাম? যাদের দাড়ি ওঠেনি তারা বাড়ী যাও। ছাত্ররা সবাই গালে হাত দিয়ে মানে মানে সরে পড়ল। মৌলানা সাহেব বাকি পঞ্চাশজন নিয়ে শিব মন্দিরের দিকে রওনা হল। তাদের উৎসাহ কিন্তু তিন গুন কমে গেছে। দেখলে মনে হয় তারা মাটি কাটতে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে শিব মন্দিরের মাঠে পৌছল। পুজার সময় সেখানে মেলা

হয়। মৌলানা সাহেব তার নাতি-নাতনিদের নিয়ে সেখানে যায়। মিষ্টি ও মাটির হাড়ী-পাতিল কিনে দেয়। আজ মাঠের চারিদিকে হিন্দু পাড়ার ছেলেমেয়েরা মায়েদের আঁচল ধরে চেয়ে আছে। পুরুষেরা ভোরে মজুর খাটতে গেছে। মৌলানা সাহেব বারান্দায় উঠল। সে যদি প্রথম কোপ না মারে, কেউ শাবল মারতে সাহস করবেনা। হঠাৎ মৌলানা সাহেব তাদের দিকে চাইল,

- ভাইসব, হিন্দুরা আমাদের মসজিদ ধ্বংস করে কি ন্যায় করেছে?
- না, ওরা অন্যায় করেছে! খুব বড় অন্যায় করেছে !
- তারা যদি মানুষের বাচ্চা হয় এখন তাদের কি করা উচিৎ ?
- মসজিদ তৈরী করা উচিৎ!
- বেশ, আমরা এই মন্দির ভেঙ্গে ফেলব। পরে যদি মানুষের বাচ্চা হই আমাদের কি করা উচিৎ?

- মন্দির... তৈরী করা উচিৎ!
- তৈরী করার জন্য টাকা দেবে কে...? কেউ উত্তর দিল না।

হঠাৎ কামিনি ব্রাম্মন এসে বলল, মৌলানা সাহেব, পায়েস হয়ে গেছে।

- এই ব্রাম্মন, তুমি আগে থেকে পায়েস তৈরী করলে কোন বুদ্ধিতে?
- সকালে যখন দেখলাম লোকেরা তোমার কাছে যাচ্ছে তখন যুদ্ধের পরিনাম কি হবে তা বুঝেছি। তখন হাড়ী বসালাম।

বাস্তবে সেই পঞ্চাশ জন চাষী মন্দিরের পাশে তাদের অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলল ও হাসতে হাসতে কামিনি ব্রাম্মনের বারান্দায় উঠে তাদের পায়েস খেতে লাগল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব কলার পাতা পরিষ্কার হয়ে গেল।

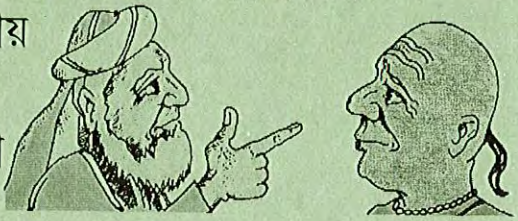

৩২০। নিপুণ কাজ

নির্মল শরীফ মাষ্টারের উপর খুব রাগ করেছে।

• স্যার, কেন আমাকে পাঁচ নম্বর দিয়েছেন? আমার রচনা ভাল হয়নি?

• তোমার ঘটনা ঘটেছিল ১১২২ সালে। তুমি লিখেছ, উৎসবের দিন ছেলেরা নতুন প্যান্ট পরেছিল ও ছোট মেয়েরা মায়ের শাড়ীর আচল ধরে দাড়িয়ে ছিল। অথচ ১১২২ সালে ছেলেরা প্যান্ট পরত না, আর সেখানকার মেয়েরা শাড়ী চিনতই না।

• স্যার, আপনি আমাদের বলেননি যে এই সব খুঁটিনাটি ভাবতে হবে।

• নির্মল, ইতিহাসের কথা ভাবতে হয় না, জানতে হয়। লাইব্রেরীতে ইতিহাসের অনেক বই আছে, তুমি গিয়ে দেখনি কেন?

• আমি যা পারি তাই করেছি স্যার।

• না নির্মল, তুমি যা পার তা করনি। এমন এক দিন আসতে পারে যখন তোমার চেষ্টার অভাবে অনেক মানুষ মরে যাবে। মনে রেখ!

নির্মল চমকে উঠল। সেদিন থেকে তার খাতায় অনেক ৯, ১০ পড়তে লাগল। তখন কাজের আনন্দ বাড়তে লাগল, নিপূন কাজের আনন্দ।

কয়েক মাস পরের কথা। একদিন বিকাল বেলা বাবা ডাকল। ছোট রেলওয়ে ষ্টেশনে বাবা ছিল স্টেশনমাষ্টার। কয়েক মাস আগে সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়েছিল, সরকার যদি এলাকাটার রাস্তা মেরামত না করে, তারা রেল চলাচল বন্ধ করে দেবে। প্রত্যেকদিন সন্ধার পরে একশ কিলোমিটার বেগে একটা ট্রেন যায়। যাবার এক ঘন্টা আগে, দুইজন কর্মচারী রেললাইনের দুইদিক পরিদর্শন করতে যায়। বাবা বলল, নির্মল, সুভাস বাবুর অসুখ করেছে। রেললাইন পরিদর্শনের জন্য তোমাকে যেতে হবে। কি করতে হয় তুমি জান। এই নাও, নিশানাটা

নিয়ে যাও। নির্মল বের হল। যেতে যেতে প্রত্যেকটি নাট-বোল্টু লক্ষ্য করে দেখছে। এক ঘন্টা হেঁটে একশ একান্ন মাইলের খুটি দেখতে পেল। তার কর্তব্য এই পর্যন্ত। সে ফিরে আসার পথ ধরল। হঠাৎ তার মনে পড়ল শরীফ মাষ্টারের কথাঃ- এমন একদিন আসতে পারে যখন তোমার চেষ্টার অভাবে অনেক মানুষ মরে যাবে... । নির্মল রেললাইনের গায়ে কান লাগাল। হঠাৎ লোহার নাড়াচাড়ার শব্দ শুনতে পেল। নির্মল শব্দের দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ একটা বাতির আলো দেখতে পেল। সঙ্গে দু'জন লোকের ছায়া। ওরা কারা? জানতে হবে। নির্মল দৌড়াল...

মাঝ পথে কিন্তু আর একজন তার পথ আগলে দাড়াল, হাতে বন্দুক। - থাম! ওখানে বসে পড় , নয়ত গুলি করব। নির্মল বুঝতে পারল, এরা রেললাইন খুলে ফেলেছে। ট্রেন থামাতে হবে, নয়ত সর্বনাশ হবে। তখন ট্রেনের দুইটি চোখ দেখা দিল। লোকটি যেই ট্রেনের দিকে তাকাল নির্মল লাফ দিয়ে ঝোপের মধ্যে পালিয়ে গেল।পর পর দু'বার বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। তার চোখে ঘুম আসল, অসহ্য ঘুম। তবু সে দোলতে দোলতে রেলের দিকে উঠতে লাগল । ট্রেনের দু' চোখ কাছে এসে গেল। নির্মল হাত তুলে লাল নিশানা নাড়াতে লাগল, একবার, দুইবার, দশবার। ট্রেনটা তার পাশ দিয়ে গেল। ব্রেকের শব্দে তার কান ফেটে যাচ্ছিল। শেষে ট্রেন থেমে গেল। তখন নির্মল ঘুমিয়ে পড়ল। নির্মলের ঘুম আর ভাংল না... । সেদিন কিন্তু যদি ট্রেন না থামত, তিনশ যাত্রী মারা যেত।

৩২১। বাঘ ও খরগোস।

সুন্দরবনে একটা বাঘ ছিল। সব পশুরা তাকে ভয় করত। তার বয়স বাড়ছিল। তার গায়ের জোর কমে যাচ্ছিল। তা যেন কেউ বুঝতে না পারে সেজন্য একটা পশু খেত আর তিনটে মেরে ফেলত। তখন এক দিন শিয়াল একটা মিটিং ডাকল। বলল, আজকের মধ্যে আমাদের চারজন মরে যাবে। তোমরা যদি আমার পরামর্শ নাও তাহলে তিনজন বেঁচে যাবে। তারা বলল, বেশ, তোমার বুদ্ধি বল। শিয়াল বলতে লাগল, আমি নিজের প্রাণের ঝুকি নিয়ে বাঘের সামনে যাব, তাকে বলে টলে রাজী করাব যাতে দিনে একটা করে পশু মেরে খায়। তবে তোমাদের শপথ নিতে হবে যে প্রত্যেক দিন আমি যাকে বলব, তোমরা তাকে বাঘের মুখে তুলে দেবে।

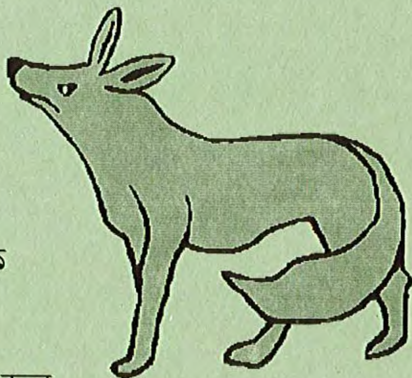

পশুরা সবাই রাজী হল। শুধু খরগোশ রাজী হল না। শিয়াল তার পরম শত্রু, ওর দ্বারা তার কোন মঙ্গল হবে না, সে জানে। তাই সে নিজের গর্তে ফিরে গিয়ে সারা দিন সারা রাত ভাবতে লাগল, কি করে রক্ষা পেতে পারে।

ঠিক পরের দিন সকালে সব পশুদের নিয়ে শিয়াল তার গর্তের সামনে এসে বলল, ভাই, তোমার মত সাহসী ও উদার এই বনে কেউ নেই। আজ তুমি বাঘের সামনে গিয়ে তোমার ভাইদের প্রান রক্ষা কর।

খরগোস তৈরী ছিল। বেরিয়ে এসে বলল, ভাই সব, একদিন তো সবাইকে মরতে হবে, আগে হোক আর পরে হোক... বেশ, আমি যাই। পশুরা আবাক। সবাই তাকে ভীরু বলে জানত, এবার তাদের ধারনা পাল্‌টে গেল। খরগোস বাঘের গুহার কাছে এসে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। বাঘ যখন ক্ষুধায় গর্জন করতে লাগল তখন তার সামনে এসে সালাম করল। বাঘ বলল, এত দেরী কেন? খরগোস বলল, হুজুর, পথে বনের রাজার সঙ্গে আমার দেখা হল। সে বলল আমি না কি তার খাদ্য, আমাকে ছাড়তে চাচ্ছিল না। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আসতে হল। বুড়ো বাঘ গর্জন করে বলল, আমি ছাড়া এই বনের রাজা আবার কে?... খরগোস বলল, দেখে যান। বলে সে তাকে নিয়ে গেল একটা গভীর কুয়ার ধারে। বলল, ঐ দেখুন! বাঘ চেয়ে দেখল, পানির ভিতর থেকে তার ছায়া রাগান্বিত হয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিল। সে গর্জে উঠল। কুয়ার ভিতরে থেকে তার গর্জন আরও জোরে ফিরে আসল। বাঘের রাগ সীমা ছাড়িয়ে গেল। দুটি থাবা তুলে হালুম করে তার শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। কুয়ার ভিতরে পড়ে হাবু-ডুবু খেতে খেতে মরে গেল।

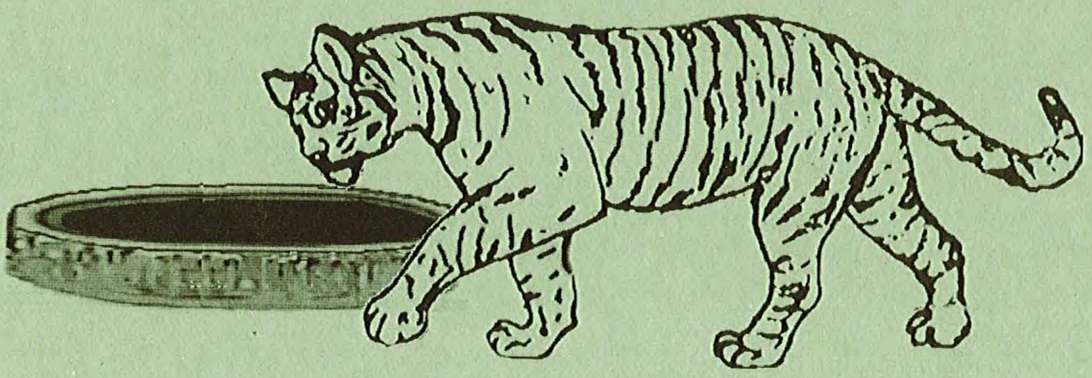

বনের পশুরা চারিদিক থেকে এসে দেখল বাঘের লাশ কুয়ার ভিতরে পড়ে আছে। তারা শিয়ালকে বলল, তুমি যেতে পার, তোমার বুদ্ধি আর আমাদের কাজে লাগে না। তার চেয়ে খরগোসের বুদ্ধিতেই চলব।

৩২২। বাড়ি বদল

ভোর চারটার সময় কাসেম কামার হাতুড়ি পিটাতে শুরু করল। হঠাৎ পাশের বাড়ির চাকর এসে ডাকল, কাসেম! কাসেম রে! মোড়ল সাহেব এক্ষনই যেতে বলেছে। কাসেম বিরক্ত হয়ে চাকরের পিছে পিছে গেল। মোড়ল বলল, কাসেম,

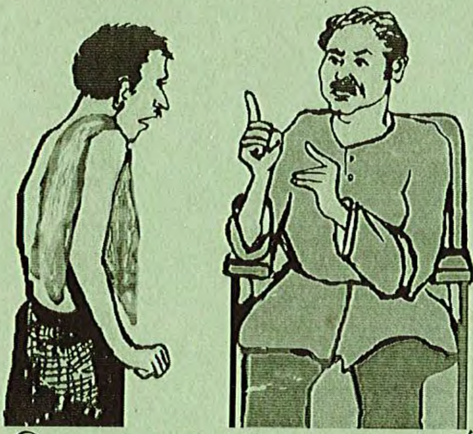

তিন দিনের মধ্যে তোমার ঘর ছেড়ে দিতে হবে, তা না হলে পুলিশকে ডেকে তোমাকে তাড়িয়ে দেব। যাও, চলে যাও! আমার আর কিছু বলার নেই! মোড়ল আবার শুয়ে পড়ল।

কিন্তু মোড়লের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে বাস করত শুভ্র কাঠমিস্ত্রী। শোয়া চারটায় শুভ্র হাতুড়ি পিঠাতে শুরু করল। হঠাৎ মোড়লের চাকর এসে হাজির। শুভ্র! শুভ্র রে! মোড়ল সাহেব এক্ষনই যেতে বলেছে। শুভ্র বিরক্ত হয়ে চাকরের পিছু পিছু গেল। মোড়ল বলল, শুভ্র, তিন দিনের মধ্যে তোমার ঘর ছেড়ে দিতে হবে, তা না হলে পুলিশকে ডেকে

তোমাকে তাড়িয়ে দেব। যাও, চলে যাও! আমার আর কিছু বলার নেই! মোড়ল আবার শুয়ে পড়ল। তিন দিন পরে মোড়ল চাকরকে ডেকে বলল, খবর নিয়ে এস, ওরা ঘর ছাড়ছে কি না। চাকর ফিরে এসে খবর দিল, ওরা দুজনে জিনিসপত্র গুচাচ্ছে, আজকের মধ্যে চলে যাবে। মোড়ল বলল, বেশ, তাদের একটু ক্ষতি তো করলাম, এই নাও, তাদের এক হাজার করে টাকা দিয়ে এস যেন আমার উপরে রাগ না করে। কাসেম ও শুভ্র টাকা পেয়ে খুব খুশী হল। হোটেলে গিয়ে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বিরানী খেল, তারপরে গান

করতে করতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। পরের দিন ভোর চারটার সময়ে মোড়ল অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ঘুমাতে ঘুমাতে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে শব্দ শুনছে। এবার কিন্তু কামারের শব্দ উল্টো দিক থেকে আসছে। একটু পরে কাঠমিস্ত্রীর শব্দও শুনতে পায়, সেটাও উল্টো দিক থেকে আসছে। মোড়ল জেগে উঠল। তখন বুঝতে পারল শব্দটা বাস্তব, স্বপ্ন নয়। সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে ডেকে বলল, দেখে এস তো, ওরা ঘর ছেড়ে গিয়েছে কি না? চাকর দৌড়ে গেল দুজনের বাড়িতে। মোড়লের কাছে ফিরে এসে বলল, ওরা দুজনেই ঘর ছেড়ে গিয়েছে বটে, তবে কামার উঠেছে কাঠমিস্ত্রীর বাড়িতে, আর কাঠমিস্ত্রী উঠেছে কামারের বাড়িতে, তাই দুজনের শব্দ উল্টো দিক থেকে শুনা যাচ্ছে।

৩২৩ সুমন ও সুমতি

অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন বনে বনে রাক্ষস-খোক্ষস থাকত। সে সময় বনের পাশে ছোট একটা ঘরে বাস করত দুটি ভাইবোন, সুমন ও সুমতি। তাদের বাবা-মা খুব গরীব, বন থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রী করত। সেই বছর সারা দেশে ফসল হয়নি। লোকের কাছে টাকা নেই, তাই কেউ বাজার থেকে কাঠ কেনে না, নিজে

নিজে বন থেকে কাঠ কুঁড়িয়ে আনে। কাজ নেই, টাকা নেই, ভাত নেই। পেটের জ্বালা কমাবার জন্য সুমন বাঁশী বাজায়, সুমতি গান গায়। কিন্তু শেষে তারা আর পারে না। বরই খুঁজতে খুঁজতে বনের ভিতরে চলে গেল। সুমন সামনে যাচ্ছিল। হঠাৎ বুবুকে ডাকল,

- দেখ বুবু কি সুন্দর ঘর! চালা রসগোল্লার তৈরী বুবু ! আর ঐ মোড়াটা দেখেছ? জিলাপীর মত রং, খেয়ে দেখব ?
- কিনতু বাড়ির মালিক আমাদের কি বলবে ?

হঠাৎ তাদের পিছনে কার গলা শুনতে পেল,

- খাও বাছারা, পেট ভরে খাও, তোমাদের গায়ে শুধু হাড় আর চামড়া। এই নাও বাছাধন। জিলাপী খাও, রসগোল্লা খাও, এই মিষ্টি আমি মন্ত্র দিয়ে বানাতে পারি। শুধু মাংস পারি না। খোকন, এ দিকে এস, তুমি এই খাঁচার ভিতরে শোবে, তাড়াতাড়ি মোটা হতে হবে বাছা, তোমার মাংস দিয়ে বিরানী তৈরী করে খাব। হা! হা! হা! হা!
- আমি মোটা হতে চাই না! আমি বাড়ি যাব!
- চুপ কর! আর তুমি ছেমড়ি, তুমি সকলের জন্য রান্না করবে আর

দেখবে তোমার ভাই যেন তাড়াতাড়ি মোটা হয়। এই নাও, বালতি ধর, পানি নিয়ে এস, রান্না চাপাও।
সুমন কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। সুমতি ভাইকে বলে, ভয় নেই, মোটা হবার আগে আমরা পালাব।
কিনতু রাক্ষসীর ক্ষুধা বাড়ছে। বলে,

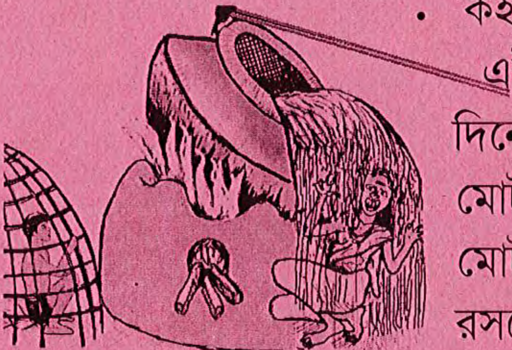

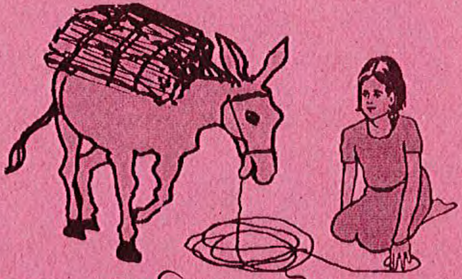

- কই, দেখি এই তিন দিনে কত মোটা হয়েছিস?... সে কি, একটুও মোটা হলি না! তবে রোজ আমার রসগোল্লা খাস কেন? না, আর সহ্য হয় না। কালকে তোকে রান্না করে খাব। এই ছেমড়ি! যাও, কাঠ কুড়িয়ে গাধার পিঠে নিয়ে এস। সুমতি কাঁদতে কাঁদতে কাঠ কুড়াতে যায়। গাঁধার মায়া হয়। বলে, কেঁদো না মা, আমার এই লম্বা দড়ি আছে। পানি ফুটলে তুমি হাঁড়ির সঙ্গে দড়িটা বাঁধ... রাক্ষুসী যেই চুলার পাশে আসবে আমি তার মাথাল উপরে উল্টিয়ে দেব... পরের দিন রাক্ষুসী হুকুম দিল, তাড়াতাড়ি পানি আন, আগুন জ্বালাও। আমার খিদে পেয়েছে। এদিকে সুমন ভয়ে মরে যাচ্ছিল।
- বুবু, আমার ভয় করছে! আমি বাড়ি যাব, আমি সিদ্ধ হতে চাই না! আমি বাড়ি যাব! আস্তে আস্তে পানি টগ্-বগ্ করতে লাগল। তখন সুমতি হাঁড়ির আংটার সঙ্গে গাধার দড়ি বেঁধে দিল। রাক্ষুসী চুলার পাশে দেখতে এল, পানি ফুটছে কি না। তখন হঠাৎ গাধা দিল হেঁচকা টান!। হাড়ি উলটে গেল। ফুটন্ত পানি রাক্ষুসীর মাথার উপর পড়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল, হায় রে হায়! মরে গেলাম রে! তারপর হাঁড়ির তলে পড়ে রইল। সুমন ও সুমতি বিদ্যুৎ বেগে পালিয়ে গেল।

৩২৪। ভুতের জামা

খোকার বয়স দশ বছর । তার বাবা নেই, মামা থাকতেও নেই, কারণ, তার কাছে গেলে মামীর মুখ কালো হয়ে যায়। মামী বলে, তুমি তো আমাদের ঘাড়ে পড়বেই। বাস্তবে এক দিন মায়ের সব টাকা ফুরিয়ে গেল। খোকাকে নিয়ে ভাইএর কাছে আশ্রয় নিতে হল। মা দাসীর মত থাকে, বাড়ির সমস্ত কাজ নিজের ঘাড়ে নেয়, কোন শব্দ করে না, কিছু চায় না। তবু মামী খুশী নয়। শুধু খোকার মামাত ভাই ইতু খুব খুশী। সারাদিন খোকার সঙ্গে খেলে, বেড়ায়, বই পড়ে, দুষ্টুমি করে। ইতুকে মাসে একবার-দুইবার ভূতে ধরে। তখন সে জ্ঞান হারায়। যখন মা মিষ্টি কেনার টাকা দিতে চায় না তখন তাকে ভূতে ধরে। ভূত তাড়াবার জন্য ওজাকে ডাকতে হয়। ওজার নাম নগদ চাচা, কারণ তাকে নগদ পঞ্চাস টাকা দিতে হয়, আগে টাকা নেবে, তারপর ভুত তাড়াবে। শেষে ইতুকে মিষ্টি সিরাপ খেতে দেবে, তখন ইতুর জ্ঞান ফিরে আসবে। ভূতের বাসা বটগাছের মাথায়। সন্ধ্যার সময় তার পাশ দিয়ে যেতে খোকার ভয় করে, ইতুর ভয় করে না, সে নাকি ভূতের আত্মীয়। খোকা এ কথা বিশ্বাস করে না, তবুও এটুকু মিথ্যাকথার জন্য তার বন্ধুত্ব কমে না,

কারণ ইতু এই বাড়িতে তার একমাত্র বন্ধু। কালকে ঈদ। ইতু খুব খুশী, সকালে সে পেয়েছে তিনটে নতুন জামা, বাবার কাছ থেকে একটা, দাদার কাছ থেকে একটা, নানীর কাছ থেকে আর একটা, সেটা হলুদ-লাল। খোকা কিছু পায়নি, তার মন খারাপ। ইতু বলে, দুঃখ কর না, আমি ব্যবস্থা করব, কোন জামাটা তোমার পছন্দ? খোকা বলে,

হলুদ-লাল জামাটা আমার পছন্দ, কিন্তু ওটা যদি আমাকে দাও, মামী এক বারও পরতে দেবে না।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ইতু চোখ উল্টিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। মা সঙ্গে সঙ্গে নগদ চাচাকে আনতে পাঠাল ও তার জন্য পঞ্চাশ টাকা জোগাড় করে রাখল। নগদ চাচা টাকা পেয়ে ভুত তাড়াতে শুরু করলঃ-

- ভূতের বাচ্চা ভূত, গত মাস তোমাকে তাড়াইনি ? ফিরে এলে কেন?

ভূত ইতুর মখ দিয়ে উত্তর দিল, এবার ওর রক্তের সঙ্গে মিশে গেছি। আর যাব না!

- বেশ, আমি ঝাটা দিয়ে পিটিয়ে তোকে তক্তা করে দেব, দাড়াও!
- যাব না। এই ছেলে তিনটে নতুন জামা পাবে আর আমি কিছু না ?
- সে কি! তুমি তো ভূত। ভূত কি ঈদের দিন নতুন জামা পরে?
- আমি তোমাদের জামা পরতে যাব কোন দুঃখে?

সেই হলুদ-লাল জামাটা খোকাই পরবে, তা না হলে ইতুকে শেষ করে ফেলব... এই দেখ, তোমরা ওর কাফন কিনতে যাও, আমি তার গলা টিপে ধরলাম কিনতু...। ইতুর গলা গড় গড় শব্দ করতে লাগল, সে আর নিঃশ্বাস টানতে পারছে না।

সবাই কান্নাকাটি করতে লাগল। তখন মা পাশের ঘরে দৌড়ে গিয়ে হলুদ-লাল জামাটা নিয়ে ফিরে এল। খোকাকে দিয়ে বলল, এখনই পরে নাও। তখন হঠাৎ ইতু বিছানা থেকে সুস্থ হয়ে উঠল। বলল,

- কি হয়েছে ? তোমরা সবাই কাঁদছ কেন?

পরের দিন কোলাকুলি করার সময় ইতু বলল, আমার নাটক কেমন লাগল খোকা? খোকা তাকে খুব জোরে আলিঙ্গন করে বলল, খুব ভাল লাগল ভাইয়া! একদিন তুমি নায়ক হবে, খুব বড় নায়ক!

৩২৫। বড় ডাক্তার

শোলাকান্দি বাজারে বাপ-দাদার আমল থেকে বৈদ্য বাবু ডাক্তারী করে আসছে। তবে নিয়ম পাল্টায়নি। সে হাটের দিন, শনিবার ও মঙ্গলবার ডাক্তারখানায় বসে ও রুগীদের ওষুধ দেয়। বাকি পাঁচ দিন সে তার জমিতে ও সবজীর বাগানে কাজ করে। লোকদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে , শনিবার ও মঙ্গলবার ছাড়া তাদের অসুখ হয় না। বাস্তবে ঐ এলাকার লোকদের অসুখ হয় না, হলেও এমনিতে সেরে যায়। এই তো সেদিন পনের বছরের বুলু তার কাছে এল। তার পেট কামড়ায়, দিনে তিন চার বার পাতলা পায়খানা হয়। ডাক্তার তার হাত পরীক্ষা করল, তার বুকে পিঠে যন্ত্রটা লাগিয়ে দেখল, শেষে বলল, তোমার কোন রোগ নেই, তবে তোমাদের খাবার পানি ভাল না। প্রত্যেক কলসিতে একটা কাগজি লেবুর রস ঢেলে দাও। আর না হয়, পানি বিশুদ্ধ করার বড়ি যেকোন দোকানে পাবে, কিনে নাও।

- কই, ওষুধ দিলেন না যে!
- দেব কেন? তোমার কোন রোগ নেই। কাল পরশু এমনি ভাল হয়ে যাবে। জান না ওষুধের মধ্যে বিষ থাকে? খাবে কেন? ঐ দেখ, দেয়ালে কি লেখা আছে পড়তে পার? আমাকে শুনাও দেখি?
- যদি সুস্থ থাকতে চাও ওষুধ খেও না ও ডাক্তারের কাছে যেও না।

তখন পাঁচটা বাজে, এমন সময় হেডমাষ্টার সাহেব তার কাছে এল।

- ডাক্তার বাবু, বাজারে আর একজন ডাক্তার দোকান খুলেছে, আপনি দেখেননি?
- দেখলাম তো। এলাকার সোভা বেড়ে গেল, তাই না?
- কিনতু রোগীর সংখ্যা এত বাড়ছে কেন

বলতে পারেন?

· তা পারি। নতুন ডাক্তার ভাষন দিতে জানে, আর তার ওষুধের দাম আমার ওষুধের চেয়ে দশ গুন, উপরন্ত তোমরা তো বোকা!

· এই তো কথা। ওষুধ কিনতে কিনতে আমার ছাত্ররা খাতা কলম কিনতে পারছে না। এই ফাঁকি বন্ধ করব কেমন করে বলুন তো?

বৈদ্য বাবু তার কানে কানে কি যেন বলল। শুনতে শুনতে স্যার হাসি ঠেকাতে পারছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তার অসুস্থ ছাত্রদের বাড়িতে গেল। তিনজন ছাত্র পঞ্চাশ টাকার ওষুধ কিনে নিয়েছিল। তারা এক সপ্তা পরে স্কুলে ফিরে এল। তখন স্যার জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করল, তোমরা এখন সুস্থ তো? তারা তিনজনই পর পর উত্তর দিল, হ্যা স্যার, বড় ডাক্তার যে ওষুধ দেয় তাতে রোগের গোড়া ধ্বংস হয়ে যায়, আর কোন রোগ থাকে না।

তখন স্যার পকেটে হাত দিয়ে বলল, এই নাও বড় ডাক্তারের ইনজেকশন। তোমাদের বাড়ি গিয়ে সেদিন আমি এগুলোর পরিবর্তে পানির ইনজেকশন রেখেছিলাম।

তোমরা এত ভাল হয়ে গিয়েছ শুধু পানি খেয়ে...। হঠাৎ তিনশ ছাত্র হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে সবার পেটে দম আটকে গেল। পরের হাটে বড় ডাক্তারের ঠিকানা বাজারে খুঁজে পাওয়া গেল না। সে তার ওষুধপত্র ও তার নতুন সাইনবোর্ড নিয়ে রাত্রে কোথায় পালিয়ে গেছে।

৩২৬। আপু কথা রাখে

এল্‌সার বয়স সাত বছর, তার ছোট ভাইএর বয়স চার বছর। তাদের দেশ যুদ্ধ করে হেরে গেছে। শত্রুদের সেনাবাহিনী গ্রামে এসে যাচ্ছে। চেয়ারম্যান সবাইকে সামনের গ্রামে পালিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছে, বড়রা হেটে যাবে, ছোটদের নিয়ে যাবার জন্য পৌরসভা একটা ট্রাক পাঠাবে। সকাল সাতটা বাজে। এল্‌সার বাবা-মা ঘাড়ে দুটো ব্যাগ নিয়ে চলে গেল। এক ঘন্টা পরে বড় একটা গাড়ি এল। গাড়ি কিনতু একেবারে ভর্তি। চেয়ারম্যান সাহেব বলল, এল্‌সা তুমি উঠে এস, আমি আধ ঘন্টার মধ্যে ফিরে এসে ছোটদের নিয়ে যাব। ভায়াকে বুঝিয়ে বল, যেন ভয় না করে। এল্‌সা বলল, ভাইয়া, তুমি ঘুমাও। কোন ভয় কর না। এক ঘন্টা পরে চেয়ারম্যান সাহেব তোমাকে নিয়ে যাবে। আর না হয় আমি আসব, তোমার কোন চিন্তা নেই! গাড়িটা দ্রুত বেগে লাইটন গ্রামে এসে পৌঁছল। ছেলে মেয়েরা নেমে গেল। চেয়ারম্যান আবার স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় এল্‌সা তার পাশে এসে বসল। বলল, যদি আপনার কোন বিপদ হয়, কে আমার

ভায়াকে ফিরিয়ে আনবে? চেয়ারম্যান সাহেব মৃদু হাসল। কিছু বলতে পারল না, মেয়েটি হাত দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিল। গাড়ি আবার দ্রুত বেগে চলল। তারা গ্রামে এসে গেছে, এমন সময় গুলির শব্দ শুনতে পেল এবং কাছাকাছি শত্রু সেনাদের ট্যাংক দেখতে পেল। চেয়ারম্যান সাহেব গাড়ি থামিয়ে বলল, ফিরে যেতে হবে। ওরা গুলি করবে। এল্‌সা বলল, আপনি যান, আমাকে ভায়ার কাছে যেতে হবে। এই বলে সে নেমে গেল ও বড় রাস্তার মাঝখান দিয়ে দৌড়াল।

একশটা ট্যাংক আসছিল পুরোটা রাস্তা ধরে। এল্‌সা এগিয়ে যাবার পথ পাচ্ছিল না, হাত দিয়ে, মুখ দিয়ে, চোখ দিয়ে চিৎকার করল, পথ ছাড়! আমি ভায়ার কাছে যাব! পথ ছাড়! তার মুখে রাগ,কান্না, অভিমান। একশটা ট্যাংক থেমে গেল। এল্‌সা তাদের মাঝখান দিয়ে দৌড়াতে লাগল। তাদের পিছনে আসছিল সেনাবাহিনীর ট্রাকগুলো, তারাও ফাঁক হয়ে গেল, এল্‌সা তাদের মাঝখান দিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগল। বাড়ি এসে বলল, তাড়াতাড়ি এস ভায়া, নয়তো গাড়ি পাব না। ট্রাক গুলোর পিছনে কয়টা জিপ গাড়ীতে বসে সেনাপতিরা আসছিল। এল্‌সা ভায়ার হাত ধরে তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। জিপগুলো থেমে গেল। সুন্দর পোষাক পরা একটা লোক, মুখ বের করে বলল, তোমাদের কি চাই?। এল্‌সা বলল, চাচা, আমরা মামার বাড়ি যাব। কোন গাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। ড্রাইভার হেসে কুটি কুটি। কিন্‌তু সেনাপতি হাসল না। বলল, তোমাদের মামার বাড়ি কোথায়? তারা বলল, লাইটন গ্রামে। সেনাপতি বলল, আমরা অন্য গ্রামে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, লাইটন গ্রামে যেতে পারব না। এল্‌সা বলল, আমার ভায়ার খিদে পেয়েছে, আর আমি তাকে কথা দিয়েছি মামার বাড়িতে দিয়ে আসব, আপনি আমাদের পৌঁছিয়ে দিন, তারপর যুদ্ধ করতে যাবেন। সেনাপতির মুখেও হাসি ফুটল, বলল, সত্যি কি তুমি ওকে কথা দিয়েছ? তাহলে উঠে এস, তোমাদের পৌছে দিয়ে আসি। যুদ্ধ এক ঘন্টার জন্য থেমে গেল। সেনাপতি পাঁচটা গাড়ি সঙ্গে নিয়ে এল্‌সা ও তার ভাইকে মামার বাড়িতে পৌছিয়ে দিয়ে ফিরে এল। তখন এল্‌সা বলল, ভায়া, যেতে আসতে আমার দেরি হয়েছে, তুমি ভয় পাওনি তো? সে বলল, কেন, ভয় পাব কেন? তুমি বলনি, ফিরে আসবে?

৩২৭। ছাগল চোর

সেদিন ভোরে উঠে রহীম দেখল ছাগলের ঘর খোলা, ভিতরে ছাগল নেই। বড় ছেলেকে বলল, ছাগলটা কই, খুঁজে দেখ। আধ ঘন্টা ধরে সারা পাড়াটা খুঁজে ছেলেটা ফিরে এল। ছাগলটা কোথাও নেই। রহিম এখনও চুরির কথা ভাবছে না। গ্রামে এই ধরনের চুরি হয় না। তবু ছেলেটাকে বলল, তালতলা বাজারে আজ গরু ছাগলের হাট বসবে। যদি ছাগলটা পাও তুমি লোকটাকে বলবে, আব্বা বলেছে ছাগলটা আর বিক্রী করতে হবে না, দাও, ফিরিয়ে নিচ্ছি। ছেলেটা দুই ঘন্টা পর ছাগল নিয়ে ফিরে এল। ছাগলটা একটা খুঁটিতে বাঁধা ছিল, সে খুলে নিয়ে আসল, কেউ কিছু বলল না।

পরের সপ্তায় কিন্তু সমবায়ের মিটিং বসলে হারুন হাত তুলে বলল, আমি জানতে চাই গত সপ্তা তালতলার হাটে আলী ভাই যে ছাগল বিক্রী করতে গেল সে ছাগলটা কার। সবাই আলীর দিকে চেয়ে রইল। ব্যাপারটা সবাই জেনে ফেলেছে। আলী চুপ করে রইল। তার চেহারা রুগ্ন, মুখে খোচা খোচা দাড়ি, চোখ দুটো যেন গর্তের ভিতর ঢুকে গিয়েছে। গত তিন মাস ধরে টি-বি রোগে ভুগছে, এখনও তার গায়ে জ্বর। আগে তার জমানো টাকা শেষ করেছিল, তারপর গ্রামের লোকেরা চাঁদা তুলে তাকে পঞ্চাশ কেজি ধান কিনে দিয়েছিল। ধান শেষ হয়ে গিয়েছে, সে এখনও সুস্থ হয়নি। আলী মুখ খুলবার আগেই রহিম হারুনকে উত্তর দিল, আমি বেচতে

বলেছিলাম। তাতে তোমার কি?

আলী অবাক হয়ে রহিমের দিকে চেয়ে রইল। তারপর উঠে দাড়াল।

বলল, রহিম, মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই। তোমরা আমার জন্য অনেক কিছু করেছ। তাই তোমাদের কাছে আবার হাত পাততে আমার লজ্জা হল। যারা নিজের ছেলেমেয়েদের না খেয়ে মরতে দেখেছে তারা বুঝবে আমি কেন এই কাজ করেছি। বলে আলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সবাই বেশ কিছুক্ষন চুপ করে রইল। শেষে রহিম বলল, ভাই সব, এই বছরে সকলের অবস্থা শোচনীয়, তবু আমরা সবাই কোন রকম বেঁচে আছি।

আমরা বেঁচে থাকতে আলীর মত একটি মানুষকে না খেয়ে মরতে দেব না। আপাততঃ এই নাও, এই দশ টাকা দিয়ে একটা গেঞ্জি কিনতে চেয়েছিলাম, তার চেয়ে খালি গায়ে বেড়াব, তোমরা যা পার দাও। সকলে পকেটে হাত দিল। রাত্রে তারা রেজাকে দিয়ে পঞ্চাশ কেজি ধান আলীর কাছে পাঠিয়ে দিল। রেজা বস্তাটা নামিয়ে বলল, আলী, আমরা সবাই গরীব, তাই বলে কি আমাদের একজন না খেয়ে মরবে আর বাকি সবাই বসে বসে দেখবে? অত খারাপ মানুষ আমরা নই, এই নাও। আলী জীবনেই কাঁদেনি, এবার তার চোখে পানি এসে গেল।

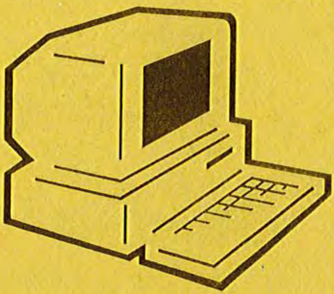

এক সময় এক কারিগর ছিল। সে সাধারণ জিনিষ তৈরী করত না, কম্পিউটার তৈরী করত। কম্পিউটার খুব জটিল যন্ত্র। তাই দিয়ে লোকেরা এক মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার যোগ-বিয়োগ করতে পারে, হাজার হাজার চিঠি লিখতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, সিনেমা দেখতে পারে আরও কত কি।

লোকটির নাম কেউ জানত না, সবাই তাকে কম্পু বলে ডাকত। তার কাজ এত জটিল ছিল, সে এত ব্যস্ত ছিল যে, পঞ্চাশ বছর বয়সে এখনও বিয়ে করার কথা ভাবতে পারেনি।

কিন্তু একদিন তার মাথায় বাজ পড়ে গেল। তার কম্পিউটার বন্ধ না করে সে খিচুড়ি ফুটাচ্ছিল, এমন সময় জানালার বাইরে দেখতে পেল, নীল শাড়ী পরা একটা মেয়ে পথ দিয়ে আসছে। কম্পু জীবনে এই প্রথম বার তার কম্পিউটারের কথা ভুলে গেল। ঘর থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

- আমার নাম নীলপরী, সবাই আমাকে পরী বলে ডাকে।

- আমার নাম কম্পু, তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি?

নীলপরী হেসে বলল, ঘরে চল, তোমার খিচুরি পুড়ে যাচ্ছে।

ঘরে এসে নীলপরী খিচুরি

নামিয়ে বলল, পরীরা বিয়ে করে না, তাদের হাজার হাজার ছেলেমেয়ের কথা ভাবতে হয়। নিজের এক বাচ্ছাকে মানুষ করতে প্রচুর সময় লাগে, সেই সময় আমার নেই।

কম্পু বলল, কিচ্ছু ভেব না, আমি কম্পিউটার দিয়ে তার ঘিলু তৈরী করে দেব, বাকি কাজ তো সহজ। নীলপরী, তুমি আমাকে বিয়ে কর। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।

নীলপরী আবার হাসল। এই সরল মানুষ তার খুব ভাল লাগছিল।

- একটা বাচ্চাকে মানুষ করতে যে সব ভাবনা, চিন্তা, কষ্ট করতে হয়, তুমি কি তা করতে পারবে?

- তুমি সঙ্গে থাকলে আমি পারব।

নীলপরী কম্পুকে বিয়ে করে তার ঘরে থেকে গেল।

পরের দিন কম্পু একটা পাকা নারিকেল কিনে এনে, কেটে খালি করে ফেলল ও তার ভিতরে একটা ছোট কম্পিউটার বসাতে লাগল। তিন দিনের মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে গেল। নীলপরী কম্পিউটারের ফাঁকে ফাঁকে ঢেলে দিল ভালবাসার দুটি চামচ, সাহসের এক চামচ, এক চিমটি রাগ, এক চিমটি ভয়, আর কয়েকটা ভুল, কারণ ভুল না করলে মানুষ শেখে না। কম্পু আঠা দিয়ে নারিকেল বন্ধ করে দিল। নীলপরীকে বলল, একটা ছেলেকে খোঁজ কর, যার ঘিলু নেই। সব মাষ্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, কার ঘিলু নেই ?। তারা বলতে পারবে।

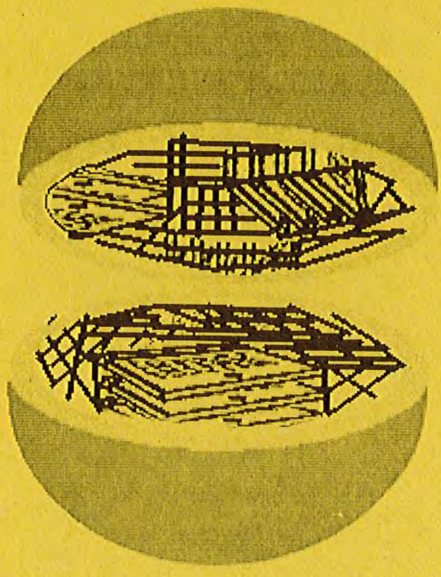

নীলপরী খুঁজতে বের হল।

৩২৯। চপলের জন্ম

নীলপরী সব স্কুল তন্ন তন্ন করে ফিরে এল। সব মাষ্টাররা বলল, এদের ঘিলু নেই। কিন্তু নীলপরী একটা গল্প বললে, সব ছেলেমেয়ে মন দিয়ে শুনল। নীলপরী বুঝতে পারল, শিশুদের কোন দোষ নেই, আসল কথা, মাষ্টাররা পড়াতে জানে না। শেষে ভাবল, ভুল করছি, যারা স্কুলে যায় না, তাদের মধ্যে খুঁজতে হবে। পরের দিন নীলপরী স্কুলের সময় পথে ঘাটে খুঁজতে লাগল। দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা মার্বেল খেলছিল, আম, জাম, লিচু চুরি করে খাচ্ছিল, লাফালাফি করছিল। তাদের একজনের মাথা ফেটে গিয়েছিল, তার সাথীরা বলল, আমরা মাথার ভিতরে দেখলাম ঘিলু নেই। নীলপরী জিজ্ঞাসা করল, তার নাম কি? সবাই হেসে বলল, ওকে সবাই চপল বলে ডাকে, চপল মানে চঞ্চল। ও শুধু দৌড়াদৌড়ি করে, আর সবকিছু ভুলে যায়।

নীলপরি তাকে ডেকে বলল, তোমার মাথা ফেটে গেছে। আমার সঙ্গে চল, সুস্থ হলে ফিরে আসবে। তোমরা সবাই কি বল?

নিয়ে যাও। যদি না ফেরে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। নিয়ে গেলে রাখতে হবে কিন্তু, ওর বাবা-মা নেই।

নীলপরী তাকে হাত ধরে বাড়ি নিয়ে গেল। চপল ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নীলপরী তার দিকে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে তার ঘুম গভীর হয়ে গেল, তখন নীলপরী কম্পুকে বলল, এবার তোমার কাজ শুরু কর। এই বলে মাথার সুতোটা কেটে দিল। মাথা খুলে গেল।

কম্পিউটার বসাতে কম্পুর কোন কষ্ট করতে হল না। চারিদিকে তুলো বসিয়ে দিল, যাতে

দৌঁড়াবার সময় না নড়ে, তারপর মাথাটা আটকে দিল। নীলপরী একটা মলম বের করে ফাঁটা জায়গায় লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক বন্ধ হয়ে গেল, ঘা-ও সেরে গেল। চপল ঘুমাতে লাগল। নীলপরী ও কম্পু সারারাত তার পাশে বসে রইল। চিন্তা-ভাবনায় পরীর চোখে ঘুম এল না। কম্পু বলতে লাগল, নতুন ঘিলুর ব্যবহার শিখতে তার এক মাস সময় লাগবে, এর মধ্যে কত বোকামি করবে কি জানি! ওকে বুঝাতে হবে, যেন পথে-ঘাটে খুব সাবধানে চলে, রাস্তা পার হবার সময় যেন দুই দিকেই তাকায়, লাফালাফি না করে... আর আমি বাড়ি না থাকলে, আমার সাইকেলে যেন হাত না দেয়। তাকে এক মিনিটের জন্যও একা ছেড়ে দিলে সর্বনাশ হবে।

নীলপরী জানালার বাইরে চেয়ে দেখল, ভোর হয়ে গেছে। তখন সে উঠে আগুন জ্বালাল ও খিচুরি রান্না করতে লাগল। আধ ঘন্টা পরে, খিচুরি তিনটি থালায় বেড়ে দিয়ে চলে এল। চপল চোখ খুলে বলল, মা, আমি মাছ মাংস দিয়ে ভাত খাই, এটা আমার অভ্যাস, ডাল দিয়ে ভাত খেলে আমার বমি আসে।

কম্পু কি যেন বলতে যাচ্ছিল, পরী তাকে চুপ করার ইশারা করে চপলকে বলল, ও ব্যাচারা! তাহলে খেতে হবে না, কালকে তোমার বাবা বেতন পাবে, তখন মাছ দিয়ে ভাত খেতে দেব, কেমন?

কিন্তু ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা তাড়াতাড়ি বাড়ে। চপল পাঁচ মিনিট পরে খেতে শুরু করল। থালাটা পরিস্কার হয়ে গেলে মা আরও কিছু খিচুড়ী দিল, সে কোন আপত্তি করল না, বমিও করল না। কম্পু মনে মনে ভাবল,পরীকে পেয়ে আমার কি সৌভাগ্য হয়েছে! ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কেমন করে ব্যবহার করতে হয়, সে খুব ভাল করে জানে।

৩৩০। চপল ভুল করে শেখে

খেতে খেতে বাবা চপলকে বুঝাতে লাগল, কেমন করে রাস্তায় চলতে হয়, পার হবার সময় কত সাবধান হতে হয়, তার সাইকেলে হাত দিতে নেই, প্রত্যেক দিন স্কুলে যেতে হয়, কারণ বোকা হয়ে থাকলে, সে আনন্দও পাবে না, কাউকে উপকার করতেও পারবে না, যারা স্কুল ফাঁকি দেয় তাদের দলে ভিড়তে নেই... আরও অনেক কথা। চপল বাবার কথায় সায় দিচ্ছিল আর খিচুড়ি খেতে খেতে বলছিল, হ্যাঁ বাবা, তা বটে, তাই করব, অবশ্যই! বাবা তার মনযোগ দেখে খুশী হল। এদিকে মা বার বার মুসকি হাসল। সে ভাল করে জানে, ছেলেমেয়েরা শুনে শুনে শেখে না, তারা দেখে দেখে শেখে আর বিশেষ করে ঠেকে ঠেকে শেখে।

এবার কম্পুর মনে পড়ে গেল, বিয়ের জন্য যে তিন দিন ছুটি চেয়েছিল সেই ছুটি গতকাল ফুরিয়ে গেছে, আজ অফিসে যেতে হবে। অফিস কাছাকাছি। সে বলল, দুপুরে খেতে আসব। সাবধান! যেন এর মধ্যে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

বাবা চলে গেলে চপল ঘরের সব জিনিষপত্র খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগল আর মাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, এটা কি? ওটা কি? কোন কাজে লাগে? শুনে শুনে সে সবকিছু পরীক্ষা করতে

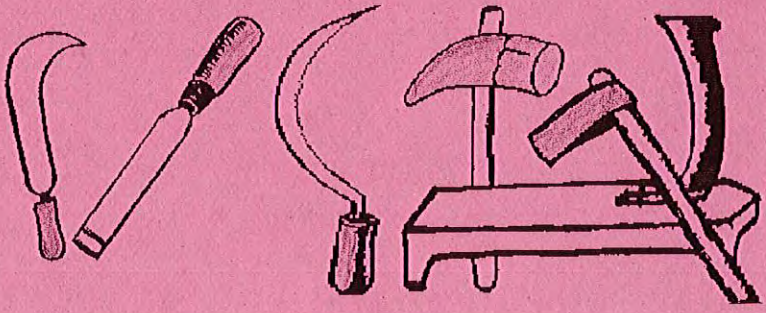

লাগল। তাকে দুই বার বলতে হল না। একবার কাঁচির ব্যবহার দেখেই সে পাকা দর্জির মত ব্যবহার করতে শিখল, এক বার কুড়ালের ব্যবহার দেখে, সে তা কাঠুরের মত ব্যবহার করতে লাগল, কোন ভুল করল না। মা আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, ওর বাবা তাকে যে ঘিলু তৈরী করে দিয়েছে তাতে কোন খুঁত নেই। কিন্তু আমি যে কয়েকটা ভুল তার ভিতরে মিশিয়ে দিয়েছি সেগুলো কোথায়? সকালে খাবার সময় একটা ভুল করেছে বটে, কিন্তু বাকিগুলো কোথায়?

শেষে চপল সাইকেলের কাছে পৌঁছে গেল। সাইকেলটি খুব সুন্দর ও খুব শক্ত। এটা ছিল কম্পুর একমাত্র দামী সম্পদ। জিজ্ঞেস করল, এটা কোন কাজে লাগে? মা তাকে জানালার সামনে এনে, একটা লোককে দেখাল। সাইকেলে চড়ে সে দ্রত বেগে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। মা বলল, সাইকেল হল তাড়াতাড়ি চলার জন্য, বড় হলে তুমিও পারবে।

- কেন, এখন পারব না কেন?

- তুমি ছোট, সিটে বসলে তুমি পেডলের নাগাল পাবে না।

- আমি পেডলের উপর দাড়িয়ে থাকব, দেখি পারি কি না?

- না বাবা, তুমি পড়ে যাবে, পড়ে গেলে তোমার হাত ভেঙ্গে যাবে, পা ভেঙ্গে যাবে...

- কিছু ভেব না মা, একবার চালিয়ে দেখি...

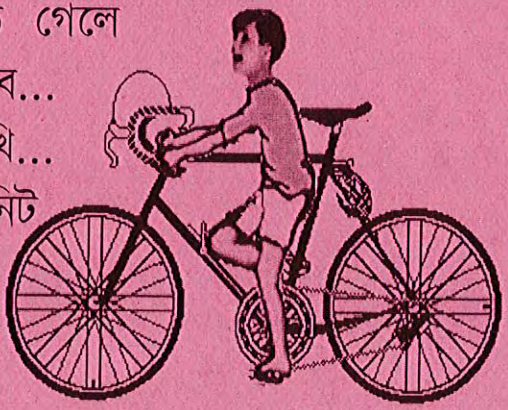

সাইকেল চড়া শিখতে চপলের দু'মিনিট সময় লাগল,তারপরে উঠানের চারদিকে এত দ্রুত চালাতে লাগল যেন জীবনে ঐ কাজ ছাড়া আর কিছু করেনি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ উঠানের শেষ প্রান্তে একটা সরু পথ ছিল বড় রাস্তায় যাবার জন্য। সেই পথ দিয়ে চপল বড় রাস্তায় চলে এল ও দ্রুত বেগে বাজারের দিকে চলল।

৩৩১। চপল মা-বাপের যন্ত্রনা

চপল সাইকেলে চড়ে বিদ্যুৎ বেগে বাজারের মাঝখান দিয়ে চলতে

থাকে, কোন ভুল করে না...
সে ভুল করে না বটে, কিন্তু রিক্সাওয়ালাদের অভ্যাস তো জান, তারা যখন ইচ্ছা দ্রুত বেগে মোড় ঘোরে, পিছনে যেই আসুক না কেন। চপল এখনও ব্রেকের কথা জানে না, তাই একটা রিক্সা যখন হঠাৎ মোড় ঘুরল, তখন সে রিক্সার চাকার সাথে খুব জোরে ধাক্কা খেল। সাইকেলের কিছু হল না, কিন্তু রিক্সার চাকা বেঁকে গেল। সব রিক্সাওয়ালারা তাকে গালি দিতে লাগল, সে ভয় পেয়ে সাইকেলে চড়ে পালাল। ওদিকে রিক্সাওয়ালা চিৎকার করে টাকা চাইতে থাকে, ছেলেটার বাবা না আসলে সে নড়বে না। রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। তখন পুলিশ এসে, ছেলেটার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করল, লোকেরা কম্পুর নাম বলল। পুলিশ কম্পুর অফিসে গেলঃ- তোমার ছেলে সাইকেল চালিয়ে অনেক মানুষের ক্ষতি করেছে। দু'হাজার টাকা জরিমানা দাও, নয়তো জেল খাটতে হবে।

- আমার ছেলে কোথায়? ওর কোন ক্ষতি হয়নি তো?
- না তো! দস্যুদের ক্ষতি হয় না, সে পালিয়েছে।
- তা... এখন আমার এক পয়সাও নেই। আমাকে বিক্রী করলেও তোমরা দু'হাজার টাকা পাবে না।
- তা হলে জেল খাটতে হবে, আমাদের সঙ্গে চল।পুলিশ কম্পুকে ধরে হাজতে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খবরটা নীলপরীর কাছে পৌছে গেল। নীলপরী থানায় গিয়ে কম্পুর সাথে দেখা করল।

• আমার ছেলে কোথায়? তার কি হয়ছে?

• তার কিছু হয়নি। সে পালিয়েছে।

• এরা কত টাকা চায়?

• দু'হাজার চেয়েছে। এক হাজার তো লাগবেই।

নীলপরী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেল। বিয়ের দিন কম্পু তাকে একটা সোনার হার উপহার দিয়েছিল। হারটা বের করে সোনার দোকানে গেল। বলল, এই হার বন্ধক রেখে কত দিতে পারবেন?

• আটশ টাকা দিতে পারি।

• আমার লাগে এক হাজার।

• তোমার শাড়ীটা গয়নার সাথে দিলে এক হাজার টাকা পাবে।

পরী বাড়ি গিয়ে তার পুরাতন শাড়ী পড়ল, তারপর হার ও বিয়ের শাড়ীটা দোকানে এনে এক হাজার টাকা নিল। জেলখানায় গিয়ে বলল, আমি এক হাজার টাকা যোগাড় করে এনেছি।

• এতে কিছু হবে না।

• তাহলে আপনারা ওকে রেখে দেন, আমি এ টাকা দিয়ে ব্যবসা করে খাব, না হয় আর একটা বিয়ে করব। কি আর করি... আমি যাই।

• দাড়াও...ঠিক আছে, এক হাজার দাও। আমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছি।

৩৩২। চপলের কাঠাল

বাড়ি যেতে যেতে কম্পু বলল, রাত দশটা বাজে, ছেলেটা সারাদিন কিছু খায়নি, আমার পকেটে এখনও দশ টাকা আছে, দেখি একটা ছোট কাঠাল পাওয়া যায় কি না...

বাড়ি পৌছে গেলে তারা প্রথম সাইকেলটা দেখল। সারাটা দিন বৃষ্টি হয়েছে। মেটো পথে কাদার ভিতর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে চপল দুটি চাকায় এত কাদা লাগিয়েছিল যে শেষে আর চালাতে পারেনি, সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে।

পরী ঘরে এসে বাতি জ্বালিয়ে দিল। চপল পাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরী তার গায়ে হাত দিয়ে দেখল তার সব কাপড় ভেজা। তার খুব মায়া হল। আস্তে আস্তে তার জামা প্যান্ট খুলে তাকে নিজের চাদর দিয়ে জড়িয়ে দিল। চপলের ঘুম ভাংল না। ভাংল দু' ঘন্টা পরে। কাদঁতে কাদঁতে বলল, মা আমার খুব খিদে পেয়েছে! আমি ডিম খেতে পারিনি, ডিমের ভিতরে বাচ্ছা হয়েছিল, বাচ্ছা পালিয়ে গেছে! বাবা-মা চেয়ে দেখল, সত্যি সত্যি খিদের জ্বালায় চপল মুর্গীর পেটের নিচ থেকে ডিম তুলতে গিয়েছিল। ফলে মুর্গীর আক্রমনে তার দু' হাত ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে, আর খিদে তার কমল না, ডিমের খোসা ছাড়া তো আর কিছু পায়নি।

বাবা কাঠালের কোঁয়া বের করে চপলের থালায় দিতে লাগল। চপল রাক্ষসের মত খেল। খেয়ে সে বিচিগুলো ফেলতে যাচ্ছিল, বাবা বলল, রেখে দাও,খাবার জিনিষ ফেলতে নেই। চপল বলল, আমি এ সব খাই না, আমি কি ছাগল! কাঁঠাল শেষ করে বলল, মা,

পেট এখনও ভরেনি! পরী কাঠালের বিচি কেটে-কুটে, লবন মরিচ দিয়ে সিদ্ধ করে দিল। চপল সব খেয়ে ফেলল। সবকিছু শেষ করে বলল, তুমি কি খেলে মা? আর তুমি কি খেলে বাবা? তারা সারা দিন কিছু খায়নি। বলল, আমাদের খিদে লাগেনি। চপল ঘুমিয়ে পড়ল। তখন মা বলল, ছেলেটার মন ভাল। শুনলে তো? আমাদের কথা ভেবেছে!

পরের দিন বাবা বলল, চপল, মানুষ হতে হলে অনেক কিছু শিখতে হয়। আমরা শুধু অর্ধেক কথা শিখাতে পারি, বাকি অর্ধেক তোমার শিখতে হবে স্কুলে গিয়ে।

- আমার বই-খাতা নেই, কলম্ নেই, স্কুলে গিয়ে কি করব?.......

বাবা তার চাদর গায়ে দিয়ে বাজারে গেল। যখন ফিরে এল তখন তার হাতে বই, খাতা, কলম ছিল, কিন্তু তার গায়ে চাদর ছিল না। শীতকাল সকালে সে শীতে কাঁপছিল। চপল বলল,

- চাদরটা নিয়ে কি করলে বাবা?

আমার দরকার ছিল না, বিক্রী করে ফেলেছি। চপলের চোখে এবার পানি আসল। বলল, বাবা, আমি মানুষ হব। এক দিন আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে। এই বলে স্কুলে গেল।

৩৩৩। চপল স্কুলে যায়

• যাবার পথে তার দেখা হল অপুর সঙ্গে। অপুর কাপড়-চোপড় ছেড়া, তার জুতা ছেড়া, তার বই ছেড়া, তার খাতা নেই। চপলের নতুন জামা দেখে বলল, চপল, তোমার ভাগ্য ভাল। তোমার বাপের টাকা আছে। তোমাকে এক রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছে।

• না ভাই, বাবার টাকা নেই, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসে।

• তাই না কি! তুমি কি করে জানলে?

• কালকে সারাদিন না খেয়ে ছিল আর রাত্রে আমাকে কাঠালটা খেতে দিল। সকালে আমার বই ও জামা কেনার জন্য চাদরটা বিক্রী করেছে।

• তোমার বাবা এই করেছে বুঝি?... আমার কপালে এই সব নেই, দেখ, আমার খাতা ফুরিয়ে গেছে, কেউ কিনে দেয়না।

• ও, তাই না কি! এই নাও, আমার খাতা থেকে দুটি পাতা নাও।

তারা স্কুলে বসল। চপলের মনোযোগ দেখে স্যার আশ্চর্য হল। জিজ্ঞাসা করল,

• কে তোমাকে লিখতে শিখিয়েছে?

• কেউ না স্যার, আমি তো বই দেখে দেখে লিখছি।

• আচ্ছা, কত দুর গুনতে পার? বিশ পর্যন্ত পার?

পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত পারি স্যার। কাল রাত্রে বাবা কাঁঠাল থেকে পঁয়ত্রিশটা কোঁয়া গুনে গুনে আমাকে খেতে দিয়েছে, তাই শিখেছি।

• তুমি এত ভাল ছাত্র হলে কেমন করে চপল?

• বাবা আমাকে স্কুলে পাঠাবার জন্য খুব কষ্ট করছে স্যার।

স্কুলের পরে অপু চপলকে এক জ্বালানী কাঠের দোকানে নিয়ে গেল।

• দেখ আমি প্রত্যেক দিন কি ভাবে আয় করি। এই বলে সে কাঠ ছিড়তে লাগল। ছোট বেলায় সে কাঠ ছিড়তে শিখেছে, কোন ভুল করে না। চপল পাঁচ মিনিট তার কাজ দেখতে লাগল। তারপরে নিজে কাঠ ছিড়তে শুরু করল। দোকানের মালিক এত দ্রুত কাজ জীবনেও দেখেনি। কাজের শেষে তাদের পাঁচ টাকা করে দিল। বলল, বেশ, তোমরা দুজনই প্রতিদিন এস, তোমাদের পাঁচ টাকা করে দেব।

অপু বলল, ভাল হয়েছে, আমার পাঁচ টাকা দিয়ে আমি খাতাটা কিনব। বাবা বকে বকুক।

• বকবে কেন? তুমি না কিনলে তাকে কিনতে হত।

• উ-হু, তুমি বুঝবে না। বাবা আমার কাছে প্রত্যেক দিন চাউলের দাম চায়, স্কুলে কি করি না করি তার কিছু আসে-যায় না।

• ও, তাই না কি! আমার বাবা চালের দাম চায় না। বলে, তুমি মানুষ হও বাবা, পড়ার দিকে মন দাও। এক দিন বড় হলে শোধ করবে, আর না পারলেও ক্ষতি নেই, এমনই তোমার দ্বারা আমাদের অনেক লাভ।

• কিসের লাভ? তুমি ক্ষতি ছাড়া তাদের জন্য কিছু করনি!

• আমি তাদের ভালবাসি আর তারা আমাকে ভালবাসে।

• আবার সেই ভালবাসা! আমি তার মানে বুঝি না।

• আমি বুঝি। যখন তাদের সঙ্গে থাকতে তোমার ভাল লাগে ও তোমার সঙ্গে থাকতে ওদের ভাল লাগে তখন হল ভালবাসা। একজনের মুখ দেখে যদি হাস, আর সেও হাসে, সেটা হল ভালবাসা... আর পেট খালি থাকলে যদি কাউকে তোমার কাঠাল খেতে দাও... বা চাদর বিক্রী করে যদি কাউকে বই খাতা কলম কিনে দাও, সেটা হল ভালবাসা।

৩৩৪। চপলের টাকার গাছ

এর পরে কয়েক দিন কেটে গেল। কাঠ চিড়তে চিড়তে অপু আর চপল বিশ টাকা করে আয় করেছিল। স্কুল থেকে বাড়ি যাবার পথে চপল আলাপ করছিলঃ-

- এবার আমার বিশ টাকা আছে। বাড়ি গিয়ে মাটির ব্যাংকে টাকা রাখব। । একশ টাকা হলে বাবাকে চাদর কিনে দেব, তারপর মায়ের জন্য একটা নীল শাড়ি কিনব, তারপর আরও কত কি!... তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল এক ভদ্র লোক। সে চপলের কথা শুনে বলল,
- বাবার চাদর এখন কিনতে হবে, না হলে তার অসুখ হবে।
- একটা চাদর কিনতে অনেক টাকা লাগবে, আমি কোথায় পাব?
- কেন? তোমার বিশ টাকা আছে। আজ রাত্রে আযব ক্ষেতে বিশ টাকা বুনলে কাল সকালে দু' হাজার টাকা পাবে। আমি সেখানে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার মাত্র এক টাকা আছে, শুধু একশ টাকা পাব।
- আচ্ছা... আমরা কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?
- পার, কিন্তু রাত্রে থাকবে কোথায়? যদি কেউ বসে বসে দেখে টাকার গাছ বাড়ে না।
- বেশ, আমরা না হয় টাকা বুনে বাড়ি আসব। সকালে গিয়ে টাকা তুলে নেব।
- বেশ। তা হলে চল। জমিটা দুরে নেই। আযব ক্ষেতে এসে ভদ্র লোকটি একটা গর্ত খুঁড়ে তার টাকাটা বুনে দিল। অপু ও চপল আর একটা গর্ত খুঁড়ে তাদের বিশ টাকা

বুনল। তারপর তিনজনই বাড়ি চলে গেল। রাত্রে চপল একটা স্বপ্ন দেখল। বড় একটা গাছে এক হাজার টাকা বাতাসে দুলছে ও ধাক্কা খেয়ে ড্রিন ড্রিন শব্দ করছে। শব্দ এত বাড়তে লাগল যে চপলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অপুকে ডেকে আজব ক্ষেতে দৌড়ে গেল। এসে দেখে ক্ষেতে কোন গাছ নেই, গর্তেও টাকা নেই। চপল কেঁদে কেঁদে বাড়ি গেল। বাবা জিজ্ঞাসা করল, কাঁদছ কেন?

• বাবা, ওরা টাকার গাছ নিয়ে গেছে। আমি টাকা পেলে তোমার চাদর কিনে দিতাম, এখন দুশ টাকা আয় করতে আমার অনেক দিন লাগবে, তোমার অসুখ হবে...

• কোন ভয় কর না বাবা, তোমার মত ছেলে যতক্ষণ আমার কথা ভাবে আমার অসুখ হবে না...। কিন্তু টাকার গাছ কোথায় ছিল? আমি টাকার গাছ জীবনেও দেখিনি, তুমি কোথায় দেখলে?.....

• ছেলের বোকামির গল্পটা শুনে বাবা-মা এত বেশী হাসতে লাগল যে চপলের মুখেও হাসি ফুটল ও তার সব দুঃখ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

৩৩৫। চপলের লেখাপড়া

চপল দেখতে অন্যান্য ছেলেমেয়ের মত, তাই বাবা-মা ভুলে গেল যে তার মাথায় ঘিলুর বদলে একটা কম্পিউটার আছে। একদিন কিনতু চপল মাকে বলল, ক্লাস ওয়ানের বই আমাকে এক বার পড়াও। স্যার এতদিন শুধু পাঁচ পৃষ্ঠা পড়িয়েছে। পরী বইটা পড়তে শুরু করল। চপল শুধু চোখ দিয়ে দেখছিল ও মায়ের কথা শুনছিল। এক ঘন্টায় বইটা শেষ হয়ে গেল। মা আবার শুরু থেকে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু চপল বলল, না না মা, এটা এখন আমি পারি। আর একটা বই পড়াও। মা বাবার দিকে তাকাল। শেষে চপলকে বলল, আচ্ছা, এখন তুমি খেলতে যাও, বিকালে আর একটা বই পড়াব। তখন কম্পু এক বন্ধুর কাছে গেল। তার পুরাতন বইয়ের দোকান ছিল । বলল, ভাই, ক্লাস টু, থ্রী, ফোরের বই আমাকে ধার দাও, কাল ফিরিয়ে দেব।

দুপুরে খেয়ে মা ক্লাস টুর বই ধীরে ধীরে পড়াতে লাগল। কিন্তু চপল বিরক্ত হয়ে বলল, একটু তাড়াতাড়ি পড় মা, আমার ভাল লাগে না। তখন মা বলল, এস, আমি রান্না করতে যাচ্ছি। তুমি এক পাশে বসে পড়তে থাক। দরকার হলে জিজ্ঞেস কর। রাত্রে খাওয়ার পরে মা কম্পুকে বলল, কাল ওকে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করে দিতে হবে... কিনতু তার উন্নতি দেখে বড়রা তাকে খুব জ্বালাতন করবে!

- তাকে বিলছড়ি স্কুলে পাঠিয়ে দেব, সেখানে কেউ তাকে চেনে না।
- সে কি! যেতে আসতে ওর দুই ঘন্টা লাগবে।

- না, সে দৌড়ে যাবে আর আসবে, তার লাগবে আধা ঘন্টা।
- তার খুব কষ্ট হবে বেচারা! তার তো বইপত্র বয়ে নিতে হবে।
- না, বই স্কুলে রেখে আসবে, বাড়িতে শিখবে নৌকা বাইতে, গাছে উঠতে, ডানগুলি খেলতে, মাটির গুলি ছুড়তে, বাঁশী বাজাতে, আর কম্পিউটার তৈরী করতে । কি বল চপল, শিখবে?
- শিখব বাবা! কালকে শুরু করি।

পরদিন সকালে চপল বিলছড়ি স্কুলে গিয়ে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হল। স্কুলে যেতে যেতে সে এত জোরে দৌড়াতে শিখল যে দশ দিন পরে তার সঙ্গে কেউ পারল না। ছেলেরা তাকে হিংসা করত।

এক দিন তারা ওর পিছনে এক বন্য কুকুর লেলিয়ে দিল। চপল দ্রুত বেগে পালাল। কিনতু কুকুর তার পিছু ছাড়ে না, তখন সে সমুদ্রের দিকে দৌড়াল। এত জোরে দৌড়াল যে তীরে এসে থামতে পারল না, সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। কুকুরও থামতে পারল না, তার পিছু পিছু সমুদ্রে ঝাপ দিল। কিনতু সে ছিল এক পাহাড়ী কুকুর, সাঁতার জানত না, চপল দেখল কুকুরটা হাবুডুবু খাচ্ছে, আর একটু হলে ডুবে যাবে। তখন তার মায়া হল, ওর একটা কান ধরে ডাঙ্গায় টেনে নিল। কিনতু রাত হয়ে গিয়েছে।

চারিদিকে অন্ধকার। চপল জানে না তার বাড়ি কোন দিকে। ভয়ে সে কাঁপতে লাগল। তখন কুকুর তার জামাটা কামড়ে ধরে তাকে টানতে লাগল। তার পিছু পিছু গিয়ে চপল একটা কুড়ে ঘরে এসে পৌছল। ঘরে কেউ নেই। চপল ঘরের কোণে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কুকুরটিও তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

৩৩৬। চপল ঘুষ খায় না

পরদিন চপল ভোরে জেগে উঠল। তার খুব খিদে লাগছিল, তাই বাড়ির দিকে দৌড়াল। হঠাৎ রাস্তার পাশে একটা আমবাগান দেখতে পেল। চারদিকে উচু বাঁশের বেড়া। চপল বেড়া ডিঙ্গিয়ে একটা আমগাছে উঠে গেল ও পেট ভরে আম খেতে লাগল। তারপর এক লাফে গাছ থেকে নেমে গেল। কিনতু বেড়া ডিঙ্গাবার সময় বাগানের মালিক তাকে ধরে ফেলল। তার ঘাড় ধরে বাড়ি নিয়ে গেল।

- তুমি দশটা আম খেয়ে ফেলেছ, দশটা আমের দাম হল পঞ্চাশ টাকা, আগে দাম শোধ কর তারপর যাবে।
- আমার খুব খিদে পেয়েছিল, মাফ করে দেন।
- তোমার খিদে পেয়েছিল তাই মাফ করে দিলাম, কিনতু টাকা দিতে না পারলে আমার জন্য একটা কাজ করতে হবে। আমার কুকুর মারা গেছে, তুমি এক মাস আমার বাড়ি পাহারা দেবে। চোর আসলে তুমি জোরে ঘেউ ঘেউ করে ডাকবে যেন আমি শুনতে পাই। মালিক চপলের গলায় একটা শিকল বেঁধে দিল এবং তালা দিয়ে মুরগীর ঘরের খুঁটিতে আটকে দিল। চপল সারাদিন কাঁদতে লাগল, তাতে কোন লাভ হল না। রাত্রে কুকুরের ঘরে শুয়ে পড়ল।

এক সময়ে তার ঘুম ভাঙ্গল। কে যেন মৃদু স্বরে ডাকছিল,

- মিটু ওঠ, আমি এসে গেছি।
- আমার নাম চপল। তুমি কে? আমি তোমাকে চিনি না।
- ও, আমি শিয়াল, তুমি নতুন কুকুর বুঝি? মিটু খুব ভাল ছিল। আমি

যখন মুরগী নিতে আসতাম সে ঘুমাবার ভান করত আর আমি তার জন্য একটা মুরগী রেখে যেতাম। তোমার সঙ্গেও এই চুক্তি রইল, কি বল? তাতে তোমারও লাভ, আমারও লাভ। চপল কোন উত্তর দিল না, তাই শিয়াল মনে করল এই কুকুর আগের কুকুরের মত। সে মুরগীর ঘরের দরজা খুলে ভিতরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে চপল দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল, তারপর ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। মালিক একটা জাল নিয়ে আসল। যেই দরজাটা খুলে দিল শিয়াল দ্রুত বেগে বের হল ও জালের ভিতরে আটকা পড়ল। মালিক তাকে লাঠি দিয়ে মেরে মেরে শেষ করে ফেলল। তারপর চপলকে জিজ্ঞাসা করল, তাকে কি করে ধরলে? চপল উত্তর দিল,

- ও আমার সঙ্গে চুক্তি করতে চেয়েছিল, সে মুরগী চুরি করবে, আমি ঘুমাবার ভান করব, সে আমার জন্য একটা মুরগী রেখে যাবে। সপ্তায় দু' দিন করে আসবে। আমি কিন্‌তু ঘুষ খাই না। আমার নাম চপল!
- তোমার বাবার নাম কি, খোকন?
- আমার বাবার নাম কম্পু। সবাই তাকে সৎ মানুষ বলে জানে।
- সে কি! তুমি কম্পুর ছেলে?... তা হলে এত দুষ্ট হলে কেন?
- আমি দুষ্ট নই। আমি দু'একটা ভুল করি। আমার ঘিলু নতুন, এখনও ভাল ভাবে তা ব্যবহার করতে শিখিনি। দু'এক মাসের মধ্যে শিখে নেব, তখন বাবা আমাকে নিয়ে গর্ব করতে পারবে। এখন আমার যেতে হবে, আপনার পঞ্চাশ টাকা আমি শোধ করে দিলাম। নমস্কার!... এই কথা বলে চপল শিকলের তালা আঙ্গুল দিয়ে খুলে ফেলল এবং মালিকের সামনে দিয়ে চলে গেল। মালিক হা করে চেয়ে রইল...

৩৩৭। চপল খেলার দেশে

তখন সকাল পাঁচটা। চপল বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখতে পেল চারটি ছোট গাধা একটা সুন্দর গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়িতে বসে সাতজন ছেলেমেয়ে গান গাচ্ছে ও আনন্দ-উল্লাসে হৈ-চৈ করছে। গানটি ছিল এইরকমঃ-

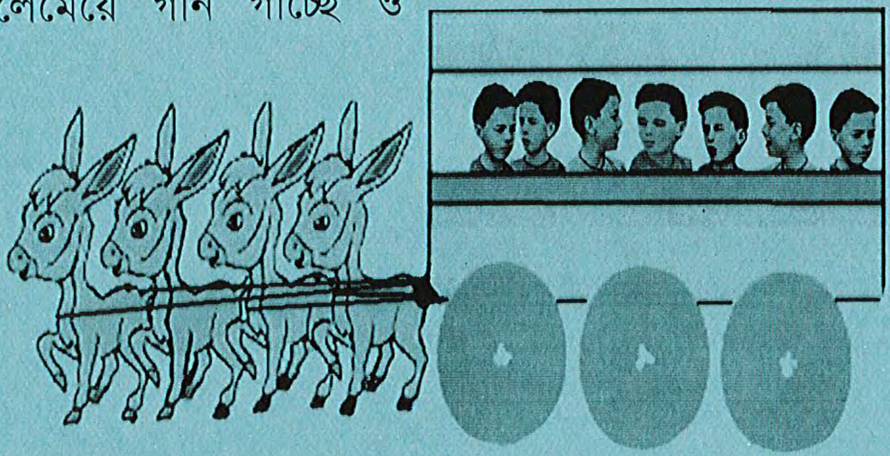

এস খেলার দেশে যাই - হেসে নেচে দিন কাটাই

খেলার দেশে সব সময় - প্রতি গাছে লিচু হয়,
আমরা যত লিচু খাই - তত লিচু পেকে যায়,
সেথায় মুরগী প্রতিদিন - পাড়ে রসগোল্লার ডিম!

হঠাৎ গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল তার বন্ধু অপু ।

- এস চপল, খেলার দেশে যাই।
- খেলার দেশে! যাব! কিনতু... বাবা-মাকে না বলে কি করে যাই?
- বাবা-মায়েরা খেলার কথা বোঝে না, তারা বোঝে শুধু কাজ।
- না বললে তারা দুঃখ পাবে, আমি তাদের বলে আসি।
- না, এই গাড়ি চলে গেলে আর কোন গাড়ি নেই। এস চপল, খেলার দেশে সপ্তায় সাত দিন ছুটি হয়, কোন পরীক্ষা নেই, সবাই পাস করে, বই পড়া লাগে না। ছাত্ররা খুব ভদ্র, তোমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেয় না, ছেলেমেয়েরা শুধু খেলা করে আর আনন্দ করে বেড়ায়...।

চপল চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল, কিনতু বেশী চিন্তা করার সময় পেল না। সব ছেলেরা তাকে ধরে গাড়িতে উঠিয়ে দিল আর গান করতে লাগল, এস খেলার দেশে যাই... চপলের কুকুর তার পিছনে দৌড়ে ঘেউ ঘেউ করে কাঁদতে লাগল, কেউ কান দিল না।

তারা সারা দিন গিয়ে সন্ধ্যার সময়ে খেলার দেশে পৌছল। পরের দিন থেকে সবাই, খেলাধুলা, দৌড়াদৌড়ি, হাসাহাসি, লাফালাফি করতে লাগল। এই ভাবে এক মাস গেল। এক দিন কিনতু তারা হঠাৎ দেখতে পেল তাদের কান বেড়ে গেছে। পিছনেও লেজ উঠে গেছে। তারা কাঁদতে চাচ্ছিল, কিনতু পারল না। তাদের মুখ থেকে গাধার ডাক বের হলঃ- ই-অঅঅ, ই-অঅঅ! সবাই গাধা হয়ে গিয়েছে। তখন দেশের রাজা সৈন্য পাঠিয়ে তাদের গলায় দড়ি পরিয়ে দিল ও বাজারে বিক্রী করতে নিয়ে গেল। চপল খুব দৌড়াতে পারত ও লাফাতে পারত। তাকে কিনে নিল সার্কাসের মালিক, খেলাধুলা দেখাবার জন্য। সেদিন থেকে তার অনেক খেলা ও লাফালাফি দেখাতে হল, আর সকালে, দুপুরে, রাত্রে, শুধু খড় খেতে হল। যখন দড়ির উপর দিয়ে হাটত তখন লোকেরা খুব বেশী হাততালি দিত। এক দিন কিনতু দড়ির উপর থেকে সে একটি মানুষের মুখ দেখতে পেল। সেই মুখে অনেক কষ্ট, সেই চোখে অনেক দুঃখ। সে অবিরত চারিদিকে চেয়ে কাকে যেন খুঁজছিল। চপল তার বাবাকে চিনতে পারল। তার দুটি চোখ পানিতে ভরে গেল। আর কিছু দেখতে পেল না। দড়ির উপর থেকে পড়ে গেল।

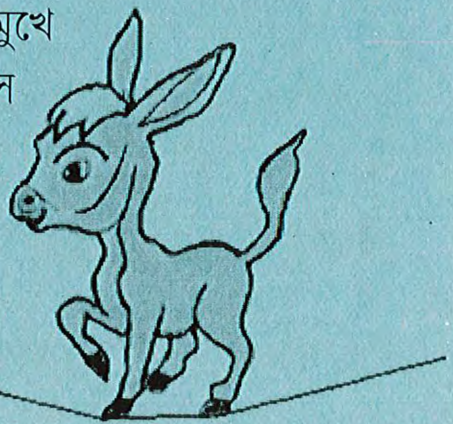

৩৩৮। চপল তিমি মাছের পেটে

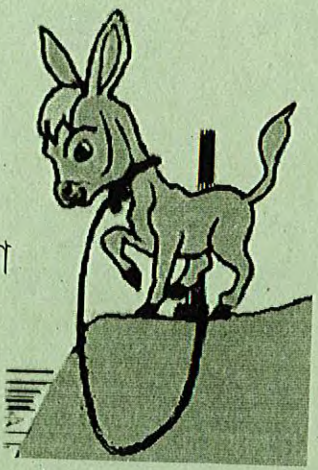

ছোট গাধার পা ভেঙ্গে গেল। ডাক্তার বলল, ওকে সুস্থ করে তুলতে তিন মাস সময় লাগবে। মালিক বলল, তার চেয়ে ওকে বিক্রী করে আর একটা গাধা কিনে নেব। তখন এক কারিগর এসে বলল, ডুগী-তবলা তৈরী করার জন্য ওর চামড়া ভাল। আমি ওকে পঞ্চাশ টাকায় কিনে নিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে ওর গলায় একটা দড়ি পরিয়ে সমুদ্রের দিকে টেনে নিয়ে গেল। সমুদ্রের ধারে একটা খুঁটির সঙ্গে দড়িটা বেধে চপলকে ডুবিয়ে মারার জন্য সমুদ্রে ফেলে দিল, তারপর ভাত খেতে গেল। ফিরে এসে তার চামড়া তুলে নেবে। কিন্তু চপল যেখানে পড়ে গেল, ঠিক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একটা বাচ্চা হাঙ্গর। বাচ্চা হাঙ্গর গাধার চামড়া খেতে ভালবাসে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ছোট ভাইকে খবর দিল ও দুজনে মিলে চপলের চামড়া খেয়ে ফেলতে লাগল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব চামড়া খেয়ে ফেলল। চপল ঠিক আগের সেই ছেলে হয়ে গেল ও সাঁতার কাটতে কাটতে ডাঙ্গায় ফিরে গেল। গিয়ে দেখে এক হাজার মানুষ সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। তারা হাত নাড়িয়ে ডাকতে থাকে, কম্পু যেও না! কম্পু যেও না!!! বেচারা চলেই গেল! ওর ছেলেকে খুঁজতে যাচ্ছে! চপলের মত দুষ্টু দুরন্ত ছেলে জগতে নেই! ঐ ছোট নৌকা ডুবে যাবে, বেচারা মারা পড়বে, বড় তিমি মাছ তাকে নৌকা সহ তাকে গিলে ফেলবে! কতজনকে সে খেয়ে ফেলেছে তার হিসাব নেই! চপল সমুদ্রের দিকে তাকাল। তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে

ডাকতে লাগল, বাবা, বাবা, ফিরে এস! এইযে আমি! বাবা!!! কিনতু বাবা তখন অনেক দুরে, কিছু শুনতে পেল না। চপল সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। অনেক্ষণ সাঁতার কেটে চপল একটা দ্বীপ দেখতে পেল। সেখানে গিয়ে উঠল ও ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল। তখন হঠাৎ দ্বীপটা নড়ে উঠল, ডুবে গেল, আবার জেগে উঠল। চপল বুঝতে পারল, এই সেই বিরাট তিমি মাছ! সে পানিতে লাফ দিল, কিনতু তিমি মাছটা তার বিরাট মুখ খুলে তাকে গিলে ফেলল। চপল পড়ে গেল তার পেটের মাঝখানে। পড়তে পড়তে চিৎকার করতে লাগল, ও রে বাবা রে! ও রে বাবা রে!!! হঠাৎ কে তার নাম ধরে ডাকলঃ- চপল! চপল! খোকা আমার! এস এস, আমার নৌকায় এস!!! চপল হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে গেল। একটা মোমবাতি জ্বলে উঠল। চপল বাবার গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, বাবা, আমার খিদে পেয়েছে। যাত্রার জন্য কম্পু চিড়া মুড়ি এনেছিল। তারা দুজনে সুখে শান্তিতে মুড়ি গুড় খেতে লাগল। খেয়ে দেয়ে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল। এক সময় চপল জেগে উঠল। তিমি মাছ নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল, তার মুখ খোলা, মুখের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছিল। চপল বলল, বাবা, ওঠ, পালাতে হবে। বাবা বলল, আমি খুব ক্লান্ত, সাঁতার কাটতে পারব না, ডুবে যাব... চপল বলল, - আমি তোমাকে সাহায্য করব, এস, না হলে এখানে মরতে হবে। তারা তিমি মাছের জিভের উপর দিয়ে হাটতে লাগল। কিন্তু তিমি মাছের কুতকুতি লাগল। সে খুব জোরে হাঁচি দিল। চপল ও তার বাবার পিঠে এত জোরে বাতাস লাগল যে তারা অনেক দুরে সমুদ্রের মাঝে পড়ে গেল।

৩৩৯। চপল বাবাকে বাঁচায়

চপল বাবার সঙ্গে ডাঙ্গার দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। তার ভয় হচ্ছিল তিমি মাছটা দৌড়ে এসে আবার তাদের গিলে ফেলবে, তাই অল্পক্ষণের মধ্যে অনেক দুরে চলে আসল। কিনতু সমুদ্রের তীর এখনও অনেক দূরে। কম্পু আর পারছিল না। চপলকে বলল, তুমি একা একা এগিয়ে যাও খোকা, আমি আস্তে আস্তে যাই। চপল কিছু শুনল না, বাবার একটা হাত ধরে টানতে লাগল। এই ভাবে আরও কিছুক্ষন তারা সাঁতার কাটল, কিনতু চপল আর পারছিল না, পরিশ্রমে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। বলল, বাবা, আমি মরে যাচ্ছি... বাবা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা কর... ঠিক সেই সময় চপল তার কুকুরের ডাক শুনতে পেলঃ- চপল, আমার পিঠে হাত রাখ, বাবাকে আমার লেজ ধরতে বল। চপলের কুকুর সাঁতার কাটতে শিখেছে ও তাকে বাঁচাতে এসেছে। তারা দশ মিনিটের মধ্যে ডাঙ্গায় পৌছে গেল। তাদের ক্লান্তি এত বেশী যে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে কিনতু চপল বাবার গায়ে হাত দিয়ে দেখল তার খুব জ্বর। সমুদ্রের ধারে এক জেলে বাড়ি ছিল। চপল জেলেকে গিয়ে বলল, আমার বাবার খুব জ্বর, বাড়ি যেতে পারবে না। দয়া করে যতক্ষণ সুস্থ না হয় গোয়াল ঘরে আমাদের থাকতে দিন, আর প্রতিদিন তাকে এক গ্লাস দুধ খেতে দিন।

- ঠিক আছে তোমরা দুজনে এখানে শুইতে পার। আমি তোমার

বাবাকে এক গ্লাস দুধ দেব, আর তোমাকে এক বেলা ভাত খেতে দেব, কিনতু তুমি ঐ কুয়া থেকে প্রতিদিন একশ বালতি পানি তুলে আমার সবজির বাগানে এনে দেবে। রাজী?

- রাজী। বালতি দিন, আমি শুরু করি। বাবার অবস্থা ভাল না।

চপল একশ বালতি পানি তুলতে শুরু করল। কাজের শেষে এত ক্লান্ত ছিল যে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এক সপ্তা গেল। বাবা আস্তে আস্তে সুস্থ হতে লাগল, কিনতু চপলের স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তাকে দেখে বাবার চোখে পানি আসত। এক দিন সকালে চপল বালতি নিয়ে কাজে গেল। তার দুই পা এগুতে চায় না। হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখল। বেহুস হয়ে বালতির পাশে পড়ে গেল।

যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন সে একটা পাটিতে শুয়ে ছিল, পাটি নাড়াচাড়া করছিল। মাথার উপরে একটা ছই। তার পাশে বসে মা হাসছিল। চপল বলল, মা, আমরা কোথায়?

- গরুর গাড়িতে বসে আছি, বাবা গাড়ি চালাচ্ছে, ঐ দেখ।
- সে কি! বাবার অসুখ! তার বিশ্রাম করতে হবে, ডাক্তার বলেছে।

তোমার ভয় নেই বাবা, সে ভাল হয়ে গেছে। ঐ দেখ, হাসছে!

- আচ্ছা মা, আমি কি ভাল ছেলে হয়ে গেছি?

- হ্যা, তুমি খুব ভাল হয়ে গেছ, তোমার মত ছেলে আর হয় না।
- সত্যি? আর কিছু বাকি নেই?
- বাকি নেই, যদি বড় না হও।
- আর যদি বড় হতে চাই?
- তাহলে স্কুলে যেতে হবে!

৩৪০। চাষী বউ

ছিল এক চাষী ও তার স্ত্রী। তারা এক ধনী লোকের জমি চাষ করত। চাষী তার বউকে কোন গোপন কথা বলত না, কারণ সে সবার কাছে বলে ফেলত। তখন চৈত্র মাস, মাঠে এত রোদ পড়ত যে চাষী শুধু রাত্রে চাঁদের আলোতে কাজ করত। এক রাতে জমি চাষ করতে গিয়ে পেল একটা কলসী। কলসীটি স্বর্ণমুদ্রায় ভরা। তার মনে পড়ল দশ বছর আগের কথা। তখন এই জমি চাষ করত এক বুড়ো লোক, সে এত কৃপণ যে লবন ছাড়া বাজারে কিছু কিনত না, শুধু টাকা জমা রাখত। এক দিন হঠাৎ মারা গিয়েছিল, টাকা কোথায় রেখেছে তা কেউ জানল না। চাষী কলসীটা বাড়ি নিয়ে আসল কিনতু সারা রাত ঘুমাতে পারল না, শুধু ভাবতে লাগল, কেমন করে স্বর্ণমুদ্রা লুকিয়ে রাখব? সকালে বউ নদীতে গোসল করতে যাবে, তখন চাষী তাকে স্বর্ণমুদ্রা

দেখিয়ে বলল, মেঝেতে একটা গর্ত খুঁড়তে হবে। দুজনে মিলে গর্তটা খুড়ল, তারপর চাষী বলল, এবার যেতে পার, বাকি কাজ আমি করব। বউ চলে গেলে সে গর্ত আবার মাটি দিয়ে ভরাট করে দিল তারপরে পাশের ঘরে আর একটা গর্ত খুঁড়ে কলসীটা সেখানে লুকিয়ে রাখল। এক ঘন্টা পরে জমির মালিক এসে বলল, আমার কলসীটা ফিরিয়ে দাও। চাষী বলল, কিসের কলসী? মালিক বলল, তুমি আমার জমিতে স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছ। তোমার বউ আমাকে বলেছে। চাষী হেসে বলল, আমার বউ তো পাগল। শুধু সোনা রূপার স্বপ্ন দেখে। মালিক বলল, আমি কিনতু রাত্রে শালিস ডাকব। তখন চাষী চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এল।

নদীতে চাষী মাছ ধরার একটা ফাঁদ পেতে রাখত। সেখানে গিয়ে

দেখল পাঁচটা মাছ খাঁচার ভিতর আটকা পড়েছে। সে মাছগুলো বরই গাছের কাঁটা দিয়ে ডালে ডালে ঝুলিয়ে দিল। বনের ধারে সে একটা ফাদঁ পেতেছিল, তাতে একটা খরগোস ধরা পড়েছে। চাষী তার ঘাড়

ভেঙ্গে, কানে একটা বর্শী লাগিয়ে নদীতে ডুবিয়ে দিল, বাড়ি গিয়ে বউকে বলল, চল, খাবার মত কিছু পাই কি না দেখি। নদীর দ্বারে এসে বউ বলল, বাঃ গাছে কি করে মাছ ধরল? আর খরগোস নদীতে কেন? চাষী বলল, কেন, তুমি জান না যে বৃষ্টি হলে গাছে মাছ ধরে আর

খরগোস নদীতে নেমে যায়?.... দুপুরে তারা মাছ-মাংস দিয়ে মজা করে ভাত খেল। রাতে জমির মালিক শালিস ডাকল। বলল, আমার জমিতে যে সোনা পেয়েছ তা ফিরিয়ে দাও। চাষী বলল, আমার বউ শুধু সোনা রূপার স্বপ্ন দেখে, সে এক পাগলী, তোমরা জান না? জিজ্ঞেস কর, কেন আজ আমাকে না খাইয়ে রেখেছে? বউ বলল, সে কি, তোমার মনে নেই, মাছ-মাংস দিয়ে ভাত খাইয়েছি? গত রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে তাই গাছে মাছ ধরেছে, আর তুমি বর্শী দিয়ে নদীতে খরগোস ধরেছ, এ কথাও তোমার মনে নেই বুঝি?... বউএর কথা শুনে সবাই হাসল। বউ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, আমি তাহলে পাগল, তাই না? দেখে এস, আমার কথা সত্য কি না! সবাই তার সঙ্গে গিয়ে ঘরের মেঝেটা খুঁড়তে লাগল। কিছু না পেয়ে সবাই হাসতে হাসতে চলে গেল। সেদিন থেকে আর কেউ চাষীকে বিরক্ত করতে এল না।

৩৪১। চিল ও পায়রা

মস্ত বড় এক চাষীর বাড়ি। চারিদিকে বড় বড় গাছ আর বিরাট পুকুর। বাড়িতে হাঁস মুরগীর বাসা। পায়রার জন্য এক সারি কাঠের বাক্স। বাক্সগুলো বেশ বড়, তবে যাওয়া আসার ছিদ্রটা ছোট, যাতে চিল, পেঁচা ঢুকতে না পারে।

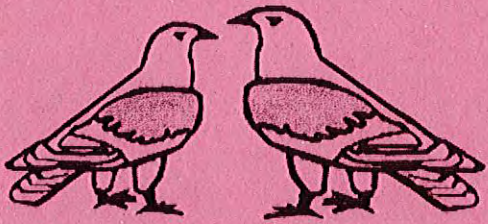

এক জোড়া পায়রা ছিল ধবধবে সাদা, ভদ্র জাতের পায়রা। তারা শুদ্ধ বাংলায় কথা বলত, শুদ্ধ বাংলায় গালাগালি দিত, অভদ্র পায়রার সঙ্গে মিশত না। সেদিন তাদের মেজাজ খুব খারাপ ছিল।

- আমাদের কপাল মন্দ। গত বছর আমরা একা ছিলাম, তখন চাষীর বউ আমাদের থালা ভরে চালের খুদ খেতে দিত...ঐ নতুন কালো পায়রা আসার পরে আমাদের থালায় অর্ধেক খুদও পড়েনা, কষ্ট করে আমাদের দূর থেকে আনতে হয়...
- ভাল কথা, ঐ চিলটা দেখেছ? গাছের ডালে বসে সারাদিন ঘুমাবার ভান করছে। কি আশা করে সে? ও চিল ভাই, শুনে যাও।
- কি, ভাইয়া, আমাকে জাগালে কেন?
- চিল ভাই, ঐ গাছের ডালে ঘুমিয়ে থেকে তোমার কি লাভ? আমরা এত বোকা নই যে তোমার কাছে গিয়ে ধরা দেব। তার চেয়ে আমাদের একটা উপকার কর, তাতে তোমারও লাভ হবে।

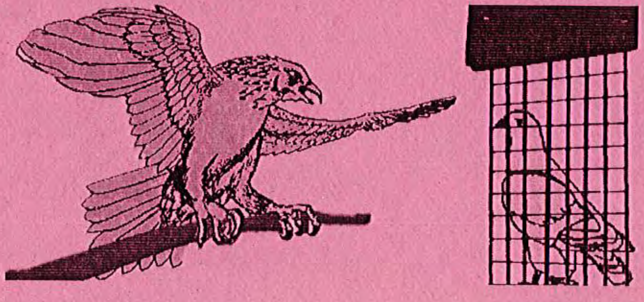

- আমি তো উপকার করার জন্যই বসে আছি। তোমরা যে কেন আমাকে এত সন্দেহ

কর আমি তা বুঝতেই পারছি না!

• তবে শোন। যে সব কালো পায়রা এই এলাকা দখল করেছে তারা অপরিস্কার, বিশ্রী, অভদ্র। তারা আমাদের এলাকার লজ্জা। কি বল?

• তা কি আর বলতে হয়! কি করতে হবে আমাকে বল।

• পুকুর ঘাটটা দেখতে পাচ্ছ? ভোরে সুর্য ওঠার আগে,ঐ সব কালো পায়রা ওখানে গোসল করতে যায়। তুমি পাশের কোন গাছে বসে প্রতিদিন একটা করে নিয়ে গেলে কেউ টের পাবে না...

সেদিন থেকে পায়রার সংখ্যা আস্তে আস্তে কমতে লাগল। রোজ ভোরে গিয়ে চিল একটা গাছের আঁড়ালে বসে থাকত। কালো পায়রা যেই গোসল করতে আসত, চিল তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত ও তার গলা মটকে দিয়ে মজা করে খেত। কেউ টের পেত না।

বর্তমানে ভদ্র পায়রা পেট ভরে চালের খুদ খেতে পায়। সকাল বেলা ভদ্র পায়রা দূরের এক ভিন্ন পুকুর থেকে গোসল করে আসে, যাতে চিল তাকে ভুল করে না ধরে। কিন্তু একদিন চিল, পুকুর পাড়ে বসে, অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেল।

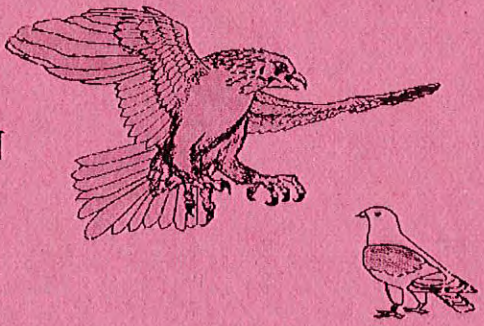

• ওরা আসছে না কেন? এক কাজ করা যাক, আজকের মত দূরের ঐ পুকুর পাড়ে গিয়ে বসি। দেখা যাক কি হয়...

ভদ্র পায়রাটা গোসল করতে এল। চিল তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

• সে কি ভাই! আমাকে চিনতে পারছ না?

• চিনব না কেন ভাই। কিনতু এত মজার অভ্যাস কেউ সহজে ছাড়তে চায়? এ ছাড়া, আসল কথা কি জান? সাদা হোক আর কালো হোক, আমার কাছে সব পায়রাই সমান... বোকা কোথাকার! এই বলে চিল তার গলা মটকে দিল।

৩৪২। ছোট ভাই

যখন মা মারা গেল তখন দুলুর বয়স দুই বছর মাত্র। সে বুবুর কাছে মানুষ হয়েছে। যখন বুবুর বিয়ে হল তখন দুলুর বয়স নয় বছর । বুবুকে সে ছাড়তে চাচ্ছিল না। রীনাও তাকে ছেড়ে যেতে পারছিল না। তবু যেতে হল। বাবা যৌতুকের টাকা যোগাড় করতে পারেনি, যার সঙ্গে তাকে বিয়ে দিল তার চারটি ছেলেমেয়ে, তার মন পাথরের মত কঠিন। রীনা কোন আদর পায় না, তার খাটতে হয় গাধার মত। এক মাস গেল। রীনা ভাবল, এই ভাবে বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল।

এক দিন তার অসুখ হল, সারা দিন কোন কাজ করতে পারল না। রাত্রে স্বামী এসে তাকে মারধর করল।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে রীনা বাপের বাড়ি পালিয়ে গেল। দুলু সকালে উঠে দেখল রীনা বারান্দায় বসে আছে। তাকে আকড়ে ধরে বলল, বুবু, এবার তোমাকে আর যেতে দেব না। রীনাও বলল, না ভাইয়া, আর যাব না।

পরের দিন কিনতু তার স্বামী এসে শালিস ডাকল। রীনা সকলের সামনে দাড়িয়ে বলল, আমি ওর কাছে যাব না। তার চেয়ে নদীতে ডুব দিয়ে মরব। সে মানুষের সঙ্গে বাস করতে জানে না, ওর একটা বউ লাগে না, তাকে একটা গাধা এনে দাও। মুরুব্বিরা কিন্তু তাকে স্বামীর বাড়িতে ফিরে যেতে হুকুম দিল, না গেলে তার বাবাকে একঘর হতে হবে, গ্রামের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

গাবতলী বাজারে গার্মেন্টসের একটা ছোটখাঁটো কারখানায় কাজ করে রীনার আপন খালা। যে দিন স্বামীর ঘরে ফেরার কথা, সেদিন ভোরে

রীনা কাদঁতে কাদঁতে গাবতলীর রাস্তার দিকে বের হল। তার হাতে দুটো পাঁচ টাকার নোট, ছোট ভাই তাকে যোগাড় করে দিয়েছিল।

এর পরে দুই মাস কেটে গেল। বুবুর কথা ভেবে দুলুর ঘুম হয় না। বড় রাস্তার পাশে তাদের গ্রাম। বাস ষ্টেশনে রোজ তার দেখা হয় আমিরুলের সঙ্গে। সে বাসে উঠে সিদ্ধ ডিম বিক্রি করে। তাকে বলল, ভাই, আমাকে গাবতলী পর্য়ন্ত পার করিয়ে দিতে হবে, বুবুকে দেখতে যাব। পারবি? আমিরুল বিনা পয়সায় তাকে কারখানা পর্যন্ত পৌছে দিল। বলল, আবার দরকার হলে বলবি।

মিষ্টি খাওয়াল, তাকে কারখানায় এনে নিজের সেলাই মেশিন দেখাল, রাত্রে দুজনে মিলে ভাত খেল, বুবু সবাইকে বলল, এ হল আমার ছোট ভাইয়া, তার মত ভাই আর হয় না। রাত্রে দুলু বুবুর কাছে শুয়ে পড়ল। সারা রাত শান্তিতে ঘুমাল। কিনতু রীনা ঘুমাল না, শুধু কাঁদল। সকালে দুলুকে বলল, এবার বাড়ি যেতে হবে ভাইয়া, এই দশ টাকা নাও। দুলু বলল, তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না। তুমি আমার সঙ্গে চল। রীনা আবার কেদেঁ কেঁদে তাকে বুঝাল, তার বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই, কেউ তাকে থাকতে দেবে না। শেষে রীনা তাকে বাস ষ্ট্যান্ডে এনে বাসে উঠিয়ে দিল। রীনা চলে যাচ্ছিল, এমন সময় দুলু বাস থেকে নেমে তার সামনে এসে দাড়াল। তার মুখে আর কোন শিশু ভাব নেই, তার বয়স যেন হঠাৎ দ্বিগুন বেড়ে গেছে। তার চক্ষু স্থির। বলল, বুবু, তুমি ভয় করো না। একদিন আমি বড় হব, তখন আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব, আমি কারও কথা শুনব না!

৩৪৩। চুলের ফিতা

স্কুল থেকে এসে সুফিয়া বক বক করতে করতে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। জানালা দিয়ে উঁকি মারল মিলি ও মুক্তি, পাশের বাড়ির মেয়েরা। তারাও রাস্তা থেকে পিঠার গন্ধ পেয়েছে। মা হাসল ও তাদের বসতে দিল। বলল, স্কুল কেমন চলছে? তারা উত্তর দিল, আমাদের পাড়ার সব মেয়েরাই ভাল, শুধু পেঁচি ফেল করে।

- পেঁচি? পেঁচি আবার কে?
- কেন? পাশের বাড়ির ঐ কালো মেয়েটি। সে স্কুলের খাতায় শুধু হিবিজিবি আঁকে আর বাজারের হিসাব করে, মাথায় তেল দেয় না, সব সময় গোমড়া মুখে কথা বলে, তাই সবাই ওকে পেঁচি বলে ডাকে।
- ও, তোমরা শোভার কথা বলছ?... বেচারী! ওর মায়ের সব সময় অসুখ হয়, তখন ঐটুকু মেয়েকে তিনটি ভাইবোন দেখতে হয়, বাজার করতে হয়, কাঠ কুড়াতে হয়, রান্না করতে হয়... তোমরা কি ঐ সব করতে পার?... এই নাও, আমার পিঠা কেমন, খেয়ে দেখ।

মেয়েরা ভাবতে ভাবতে পিঠা খেতে লাগল। শেষে মা বলল,

- আমার জন্য এক কাজ করবে? কাউকে বলতে হবে না কিনতু!
- করব। আমরা কাউকে বলব না, কথা দিলাম।

মা তাদের অনেক্ষণ বুঝাতে লাগল। মেয়েদের মুখে বার বার হাসি ফুটল। শেষে মুক্তি ও মিলি বাড়ি গেল। এদিকে সুফিয়া শোভার কাছে গিয়ে বলল, মা রাগ করেছে, কেন তার পিঠা খেতে এলে না? দৌড়ে এস। শোভা এসে খেতে বসল। শেষে মা বলল, শোভা, তোমার এত সুন্দর চুল! এই লাল ফিতা নাও, চুল বাঁধবে। কিন্তু আমার জন্য একটা কাজ করতে হবে। স্কুল থেকে ফিরে আসার সময় রোজ

এখানে থামবে। সুফিয়ার সঙ্গে স্কুলের পড়া সেরে বাড়ি যাবে। তুমি নাকি অংকে খুব ভাল?... শোভা হা করে চেয়ে রইল। পরের দিন তার কালো লম্বা চুল তেল দেওয়া ছিল ও লাল ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল। স্কুলের পথে তার সঙ্গে দেখা হলে মিলি বলল, বাঃ সোভা, আজ

তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। এবার শোভা হাসল। হাসিমুখে স্কুলে পৌছে গেল। সেখানে সুফিয়া বলল, শোভা, তুমি যখন হাস তখন তোমাকে খুব সুন্দর দেখায়! সেদিন আপা তাকে কোন তিরষ্কার করল না। টিফিনের সময় সে সুফিয়া ও মিলির সঙ্গে খেলা করল, আর প্রান খুলে হাসল। বাড়ি যাবার পথে থেমে গেল সুফিয়াদের বাড়িতে। সত্যি, বাজার করতে করতে সে খুব দ্রুত অংক কষতে শিখেছে, তবে বাকি সব বিষয়ে সে খুব কাঁচা, সুফিয়ার সঙ্গে পেরে উঠতে তার ছয় মাস লাগবে । কিনতু তার ব্যবহার রাতারাতি পালটে গেল। তার তিন বান্ধবীর প্রশংসা শুনে শোভা হাসতে শিখেছে। এখন আর কেউ তাকে পেঁচী বলে ডাকে না। বছরের শেষে আপা বলল, শোভা পড়ালেখায় চতুর্থ স্থান পেয়েছে, কিনতু এই বছরে তার মত কেউ এত উন্নতি করেনি। এস শোভা, এই নাও তোমার পুরষ্কার। শোভার দু'চোখ পানিতে ভরে গেল। সুন্দর বইটা হাতে নিয়ে সে এক কান্ড করে ফেলল। আগে সুফিয়ার গলা জড়িয়ে ধরল, তারপর মিলি আর মুক্তির গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধতে লাগল। কেন সে অন্য মানুষ হয়ে গেছে, তা সে বুঝে ফেলেছে।

৩৪৪। দাদা চলে গেল

মানিক স্কুল থেকে ফিরে এসে বলল, মা, আমি আর স্কুলে যাব না। সকলের বই আছে, শুধু আমার নেই, বই না কিনলে স্যার বাড়ি থাকতে বলেছে। মা চুপ করে রইল, মানিকের বাবার অসুখ এখনও সারেনি। দাদা পৌরসভায় কাজ করত। এখন, ষাট বছর বয়সে, ওরা তাকে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দিয়েছে। কিনতু সেই টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে... মানিকের মা ভাবছে, স্বামী, শ্বশুর, আর তিনটে ছেলেমেয়েকে কি খেতে দেবে? মা বলল, আর কিছুদিন সবুর কর খোকা, তোমার বাবা কাজ করতে পারলে বই কিনে দেব। মানিক রাগ করে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় দাদা তাকে ডাকল, মানিক, ক্লাস সিক্সের বই গুলোর দাম কত? মানিক বলল, পাঁচশ টাকা। দাদা বলল, চল, বাজারে যাই। মানিকের মা খুব আপত্তি করল, খুব রাগ করল, কিনতু দাদা কোন কথা শুনল না। এক ঘন্টা পরে মানিক দাদার সঙ্গে হাসিমুখে বই নিয়ে ফিরে এল। তখন মা রান্নাঘরে কাদঁছিল, তারা দেখলই না। মানিক বই খুলে দেখতে লাগল ও দাদা ছোটদের পড়াতে লাগল।

এই ভাবে এক মাস কেটে গেল। বাড়িতে অভাব বাড়তে লাগল, অশান্তিও বাড়তে লাগল, দাদা সারা দিন বাইরে থাকে, শুধু রাত্রে ফিরে আসে, ছেলেমেয়েদের পড়ায় ও দুটি ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে। কিনতু এক দিন সকালে মানিক তার বিছানার পাশে একটা চিঠি পেল। " দাদু, অভাব যতক্ষণ না মেটে তোমাদের ভাত খেতে পারব না, আমি নিজে কাজ করে খাব। ইতি তোমার দাদু।"

মানিক চিঠিটা পড়ে একটা ঝর্ণার মত কাদঁতে লাগল। তার ছোট ভাই ও বোন কান্নায় যোগ দিল। সেদিন কেউ স্কুলে গেল না, আর সকলে মাকে দোষ দিতে লাগলঃ- তুমি কেন দাদুর সঙ্গে শুধু ঝগড়া কর? দাদু চলে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে! দাদু খুব ভাল ছিল, আমাদের

পড়াত, আমাদের সঙ্গে খেলত আর কোন সময় বকা দিত না। তুমি দাদুকে তাড়িয়ে দিয়েছ, দাদুকে ফিরিয়ে আন! শেষে মাও কাদঁতে শুরু করল। কিনতু কাদঁলে কি হবে? দাদু কোথায় তা কেউ জানে না। শেষে সবাই চুপ হয়ে গেল। বাড়িতে আর কেউ চিল্লায় না, কেউ হাসে না। মানিক স্কুল কামাই করে এদিক-ওদিক দাদুকে খোঁজে। রাত্রে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে, মা না ডাকলে ভাত খেতেও আসে না।এক মাস পরে একটা চিঠি এল। "দাদু,আমি ভাল আছি, তোমার বাবা আর তোমরা সবাই কেমন আছ? এই ঠিকানায় চিঠি দিয়ে জানাও, আব্দুল ডাকপিওন, খুলনা জি,পি,ও,। সে আমাকে খুঁজে পাবে।" মানিক সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনে গিয়ে খুলনার ট্রেনে উঠল। খুলনায় এসে দেড় ঘন্টা হেটে জি,পি,ও তে গিয়ে আব্দুল পিওনকে খুঁজে পেল। সে তাকে একটা বিরাট মাঠ দেখাল। সেখানে লোকেরা খোয়া ভাংছিল। তাদের মধ্যে সে খুঁজতে লাগল, কিনতু দাদাকে পেল না। সে কেঁদে কেঁদে চলে আসছিল,এমন সময় কে ডাকল, দাদু, এই যে আমি! মানিক তার গলা জড়িয়ে বলল, দাদু আমরা তোমার জন্য শুধু কাঁদি, আমাদের খাওয়া-ঘুম নেই, চল, আমি তোমাকে ছাড়ব না... না, তুমি কিছু বলতে পারবে না, চল!

৩৪৫। রনির দুষ্টামি

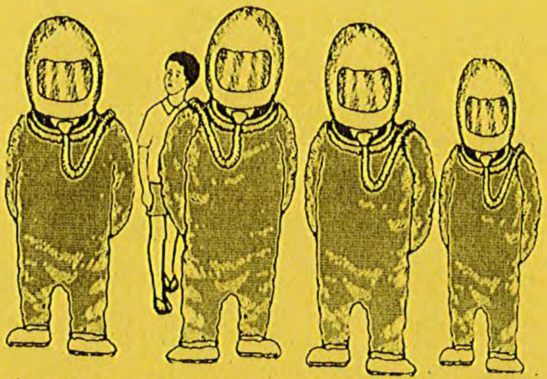

২০০৯ সালের ১৬ই জুলাই। ৪০ বছর আগে রনির দাদা রকেটে চড়ে চাঁদে নেমে গিয়েছিল। এবার রনির বাবা যাবে। রনি তার বাবা ও দাদার আলোচনা শুনতে শুনতে সব মুখস্থ করে ফেলেছে, চাঁদের কোন জায়গায় নামতে হবে, কোন পাহাড়ের গায়ে গভীর একটা গর্ত খুড়ে সেই নতুন পাথর বার করতে হবে যা হীরার চেয়ে দশ গুন বেশী শক্ত, তাই দিয়ে যেকোন ধাতু পানির মত কেঁটে ফেলা যায়, আরও অনেক কথা। এক দিন দাদা বাড়িতে একা ছিল। রনি তার জন্য নিজের টাকা দিয়ে একটা কোক কিনে নিয়ে আসল। বলল, নাও দাদু, তোমার জন্য কিনেছি। দাদু বলল, কি চাও আগে বলে ফেল। রনি বলল, দাদু, বাবা যে কাজ করতে যাচেছ সে কাজ খুব বিপদজনক। আমি তাকে একা যেতে দেব না। আমি সঙ্গে যাব। আমাকে একটা উপায় করে দাও। দাদু হা করে রইল... বলল, আমাকে একটু সময় দাও। তিন দিন পরে রনীকে বলল, চল, নদীর ধারে গিয়ে বসি। তারা তিন ঘন্টা পরে ফিরে এল। ফেরার পথে এক দোকান থেকে কিনে নিল লম্বা একটা নাইলনের দড়ি, হাল্কা আর মজবুত, ও তিনটি লম্বা পেরেক। তারপর কেমন করে রকেটে উঠে দুই দিন ডাষ্টবিনে লুকিয়ে থাকল তা সে জানে ও তার দাদু জানে। দু'দিন পরে চারজন যাত্রীকে নিয়ে রকেট মহাশূন্যে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন ডাষ্টবিনের ঢাকনা হঠাৎ খুলে গেল। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। রনি বলল, বাবা, তোমাকে সাহায্য করতে এলাম, তুমি কিছু ভেব না। যাত্রীদের মধ্যে একটা মহিলা ছিল। রনি বলল, খালাম্মা তোমার চাঁদের পোষাক দুটি আছে, আমি

একটা পরব। সবাই হাসছিল। বাবা কিছু বলল না। কে ওকে সাহায্য করেছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল। রকেট চাঁদে নেমে গেল। সবাই পোষাক পরে জিনিষপত্র নামাতে লাগল। সবাই যেন পাগলের মত লাফাচ্ছিল কারণ চাঁদে তাদের ওজন ছয় গুন কমে গেছে। তবে রনি আধা ঘন্টার মধ্যে যে ভাবে চলাফেরা করতে লাগল, মনে হাচ্ছিল যেন সেখানে তার জন্ম। কাজের বেলায় তার সঙ্গে কেউ পারল না। তার সাহায্যে যন্ত্রপাতি নামাতে তাদের একটুও সময় লাগল না। তারপর পাহাড়ের গায়ে গর্ত খোড়ার জন্য তারা মেশিনটা উঠাতে লাগল। তখন হঠাৎ রনি চিৎকার করে উঠল, বাবা, থাম! পিছলে পড়ে মরবে! কেউ ভাবেনি ওজন কমে যাওয়ায় তারা সহজে পিছলে পড়তে পারে। ধারালো পাথরের গায়ে পড়লে যদি তাদের পোষাক ছিড়ে যায়, কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। রনি খুব সাবধানে উঠল। একটা পাথর দিয়ে মেরে তিনটি পেরেক পাহাড়ের গায়ে বসিয়ে দিল, তাতে দড়িটা লাগিয়ে সেটা প্রত্যেকের কোমড়ে বেধে দিল। এবার তারা মেশিনটা চালু করল। পাহাড়ের গা থেকে সেই উজ্জল আশ্চর্য পাথর বের হতে লাগল... । তখন হঠাৎ মেশিনের চালক

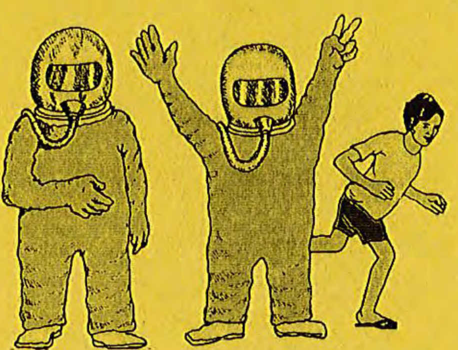

পিছলে পড়তে যাচ্ছিল। দড়িটার জন্য বেঁচে গেল। সবাই রনির দিকে তাকাল... কেউ কিছু বলল না। এর পর আর কোন দূর্ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু পৃথিনীতে ফিরে এসে শূন্যযান থেকে নেমে, রনি যখন পালাতে যাচ্ছিল, তখন রাষ্ট্রপতি তাকে ধরে ফেলল। তার পাছায় এক থাপ্পর মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু দাদু তার হাত ঠেকিয়ে বলল, এবারের মত ওকে মাপ করে দিন, এমন কাজ আর করবে না, কথা দিচ্ছি।

৩৪৬। এই দেশ আমার!

নদীর ধারে জেলে পাড়ার পনেরটা হিন্দু ঘর খালি। পাকিস্তানীরা যত হিন্দু পায় তাদের মুক্তিবাহিনী বলে মেরে ফেলে। এই মাসে জেলেরা নেই বলে নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। আলী নদীর ধারে কোচ দিয়ে মাছ মারে। আজ একটা লঞ্চ এগিয়ে এল। লঞ্চের ভিতর থেকে এক দল সৈন্য তার দিকে তাকাচ্ছিল। আলীর কোচটা দেখে ক্যাপ্টেন বলল, মুক্তি হ্যা! ফাইয়ার! আলী মারা গেল। তার বয়স ১৫ বছর। এক সপ্তা পরে ক্যাপ্টেন আবার জিপে করে গ্রামে এল দশজন সৈন্যকে নিয়ে। মুক্তিবাহিনীরা খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন সহ চারজনকে গুলি করে মেরে ফেলল। দুঃখের বিষয়, গ্রামবাসীরা যখন তাদের কবর দিতে এল, তখন দেখল বুলুর সাদা ছাগলটাও মারা গেছে। বুলুর বয়স ১২ বছর। কত বার সে ঐ ছাগলের দুধ খেয়েছে! তার ছাগল দেশের জন্য মারা গেছে। এখন সে কি করবে? তাকে কবর না দিলে শিয়াল কুকুরে খেয়ে ফেলবে। বুলু বলল, ওদের কবরের মধ্যে জায়গা আছে,

ওদের সঙ্গে তাকে কবর দাও। গ্রামবাসীরা তাই করল, তারপর নদীর ওপারে পালিয়ে গেল। বুলু পাঁচটা ইট খুঁজল। বাড়ি থেকে চুনের কৌটাটা এনে সকলের নাম লিখল ঃ- সেপাই নং ১ - সেপাই নং ২ - সেপাই নং ৩ - বোকা ক্যাপ্টেন - বুলুর ছাগল। ইটগুলো নিজ নিজ জায়গায় বসিয়ে চলে গেল। তারপরে এক সপ্তা কেটে গেল। বুলুর মন কাঁদে, গ্রামে ফিরে যাবে। শেষে আর টিকতে পারল না। খেয়া ঘাটে গিয়ে দেখে মাঝি নেই। বৈঠা ধরে টানতে লাগল। নৌকার খোলে মাছ

লাফালাফি করছে। মাঝি খেয়া ব্যবহার করেছে মাছ

ধরার জন্য। বুলু পার হয়ে নৌকা বেঁধে তার ছাগলের কাছে গেল। কবরের সামনে বসে চোখের পানি ফেলতে লাগল। হঠাৎ তার পিছন থেকে কার কথা শুনতে পেল, "তুম কিয়া হ্যা? " বুলু আগে থেকে উত্তর মুখস্থ করেছে, "আম আল্লাহ আকবর" বলে চোখ মুছতে মুছতে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। তারা ছিল পাঁচজন, তালগাছের মত লম্বা। জিজ্ঞাসা করল, "ক্যাপ্টেন কাহা? " বুলু হাত বাড়িয়ে কবরগুলো দেখাল। তারা এগিয়ে গেল ও পাঁচটা ইটের লিখন পড়তে চেষ্টা করল। কেউ পারে না। শেষে তালগাছের মত মানুষটি বলল, ইয়া ক্যাপ্টেন হ্যা। তার ব্যাগ থেকে পতাকা বার করে, ছাগলের কবরের উপর বিছিয়ে দিল। সবাই কপালে হাত দিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে ছাগলকে স্যালুট করতে লাগল। হাসি ঠেকাতে বুলুর খুব কষ্ট হচ্ছে, ভাবছে, এরা বাংলা বলতে জানে না, পড়তেও জানে না, এরা কি না আমার দেশে মাতুব্বরী করতে আসে!... এবার লম্বা তালগাছটি জিজ্ঞাসা করল, মুক্তি কাহা? বুলু বলল, "নেহি"। তালগাছটি বলল, ব্রীজ কাহা? বুলু আবার বলল। "নেহি, নৌকা হ্যা"। তারা খেয়া ঘাটে নেমে গেল।, খেয়ায় ওঠার সময় মনে হল যেন তারা কোন দিন নৌকায় ওঠেনি, আর এরা কি না বুলুর দেশ শাসন করবে! হঠাৎ নদীর মাঝে এসে নৌকার খোলে বড় বড় মাছ লাফালাফি করতে লাগল। তালগাছটি বলল, মুক্তি হ্যা! ফাইয়ার! সবাই মেশিনগান নৌকার খোলে চালাতে লাগল। এক মিনিটের মধ্যে নৌকা ডুবে গেল। বুলু সাঁতার কেটে তীরের দিকে চলল। পিছনে চেয়ে দেখতে পেল পাঁচটি সৈন্য হুস-হাস করতে করতে পানির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার একটু মায়া হল, কিন্তু ডাঙ্গায় এসে বলল, এবার বুঝলে এই দেশটা কার? এই দেশে তোমাদের কবরের জায়গা দিতে পারি, আর কিছুই দেব না!

৩৪৭। ঈশা খাঁ

তিনশ বছর আগে ভারতবর্ষে সম্রাট আকবর রাজত্ব করত, কিনতু বাংলাদেশ দখল করতে পারেনি। একদিন প্রধান সেনাপতি মানসিংহ বলল, মহারাজ আমি এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ দখল করতে পারি। আকবর উত্তর দিল, তুমি ওদের চেননা। ভাল্লুক যতক্ষণ আক্রমন না করে ততক্ষন জানবেনা তার নখ কত ভয়ানক। এর আগে যারা ওদের বিরক্ত করতে গেল, তারা সম্মান রেখে ফিরতে পারল না। মানসিংহ বলল, এর আগে কিন্তু আমি সেনাপতি হইনি। সম্রাট বলল, বেশ, বাংলাদেশ দখল করে এস, আমাদের সম্মান যেন থাকে। মানসিংহ বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে এল। তবে রওনা হওয়ার আগে বাংলাদেশের শাসনকর্তা ঈসা খাঁ খবর পেল। তার কয়টা পোষা কাক ছিল, তারা খবর নিয়ে আসল। মানসিংহ যত গুপ্তচর সীমান্তের এপারে পাঠিয়ে দিল সবাই শিশুর মত ধরা পড়ল। মানসিংহ বিপদে পড়ল। কোন পথ দিয়ে আক্রমন করবে, ঈসা খাঁর সেনাদল কোথায় উৎ পেতে

আছে, সে কিছুই জানে না। তার মনে একটা বুদ্ধি এল। কৃষকরা মাঠে ধান কাটছিল, তাদের দুজনকে ডেকে বলল, তোমাদের ঈসা খাঁর মত কাপুরুষ আর নেই। সে একটা শিয়ালের মত পালাচ্ছে। মানসিংহের কথা সেই রাত্রে ঈশা খাঁর কানে পৌঁছে গেল। সেই একই রাত দুপুরে মানসিংহ গভীর ভাবে ঘুমাচ্ছিল,

এমন সময় কে যেন তাকে জাগিয়ে দিল। সে তলোয়ার ধরতে গিয়ে পেল না। লোকটি বলল, আপনার তলোয়ার আমার কাছে, এই নেন। আমি ঈশা খাঁর দূত। তিনি এই চিঠি আপনাকে দিতে বলেছেন। উত্তর পেলে খুশী হবেন। মানসিংহ অবাক। লোকটি দুটো প্রহরীর পিছন দিয়ে এসেছে, তার মুখে কোন ভয় নেই, মনে হয় যেন শিশুদের খেলা দেখে মজা পাচ্ছে...। মানসিংহ চিঠিটা পড়লঃ- "শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি ও আমার সেনাদল কাপুরুষ নই, তবে দরকার না হলে নিজের প্রাণ ও সৈন্যদের প্রাণ বিপদে ফেলতে আমার ইচ্ছা নেই। আপনার যদি সাহস থাকে আসুন, আমরা দুজনে যুদ্ধ করি, যার জয় হবে এই দেশ হবে তার"। মানসিংহ বাধ্য হয়ে প্রস্তাব মেনে নিল। তিন দিন পরে দুটি সেনাদলের সামনে তাদের যুদ্ধ হল। মানসিংহ বলল, এবার আসুন। ঈশা খাঁ উত্তর দিল, আমাকে আঘাত না করলে আমি আঘাত করি না। তখন মানসিংহ আঘাত করল। তাদের অপূর্ব কৌশল দেখে সবাই হতভম্ভ হয়ে রইল। হঠাৎ ঈশা খাঁ এমন কৌশলে শত্রুকে আঘাত করল যে ওর তলোয়ার ভেঙ্গে গেল। মানসিংহ ভাবল, এবার রক্ষা নেই। কিনতু ঈশা খাঁ তলোয়ার নামিয়ে বলল, এই নেন আমার তলোয়ার, আমি আর একটা জোগাড় করব। মানসিংহ বলল, বাংলাদেশ দেখেছি, এবার বাংলাদেশের মানুষ দেখলাম। না, আর যুদ্ধ করব না। আজ থেকে আপনাদের স্বাধীনতা আমি প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।

৩৪৮। ঝগড়া

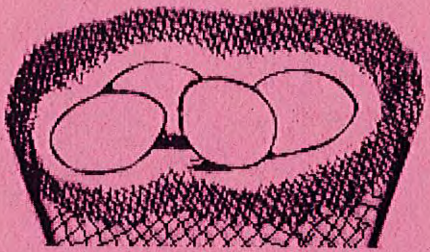

বাপ্পার মা উঠান ঝাড় দিতে এসে চেচিয়ে বলতে লাগল, যাতে বেড়ার ওপাশে রীতার মা রান্নাঘরে বসে পরিষ্কার শুনতে পায়,

• ওরা না খেয়ে আছে নিশ্চয়। তা না হলে আমাদের মুরগীর ডিম চুরি করবে কেন? এই দেখ, আমার ছয়টা মুরগী ডিম পাড়ে, এখানে তিনটা ডিম, বাকি তিনটা কই?

ওপাড় থেকে রীতার মা উত্তর দেয়, আমার মুরগী বুঝি ডিম পাড়ে না? আমি রোজ তোমাদের কাছে দশটা ডিম বেচতে পারি, আমি তোমাদের সাথে শুধু ঝগড়ায় পারি না, ঝগড়া হল তোমাদের পেশা।

• ঝগড়া আমাদের পেশা হতে পারে, তোমাদের পেশা হল চুরি।

• চুরি কারা করে? আমরা, না তোমাদের ছেলেমেয়েরা? তোমাদের ছেলেমেয়েদের জ্বালায় এ বছরে আমার বাগানের একটা লিচুও খেতে পারিনি!

এই বলে রীতার মা একটা লাঠি নিয়ে বাপ্পাদের রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, কিনতু মাঝ পথে থেমে রইল, কারণ বাপ্পার মা বের হল বটি নিয়ে। ভাগ্যিস ঠিক সে সময়ে বাপ্পার বাবা মাঠ থেকে ফিরে

আসছিল লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে। বউ ঘরে ফিরে গেল। একটু পরে বাজার থেকে ফিরে এল রীতার বাবা। বউএর কাছ থেকে ব্যপারটা শুনে পাঁচটা ডিম নিয়ে বাপ্পাদের বাড়ি গেল। জিজ্ঞাসা করল, কয়টা ডিম তোমাদের কম পড়েছে?

বাপ্পার বাবা উত্তর দিল, কেন?... ও বলে তিন-চারটে, আমি জানি না।

- এই নাও। যদি আবার কম পড়ে আমাকে বলে দিও।
- সে কি, আমি ডিম পাব কি না তাও জানি না, নেব কেন?
- নিতে হবে। আমি কি চারটা ডিম নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব?
- বস, চা খেয়ে যাও। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করার উপায় নেই! শোন, আমাদের কাছে এখনও বিশ পঁচিশটা আম রয়েছে। এই ধরনের আম বাজারে আর পাবে না। এই চারটা আম নিয়ে যাও।
- না ভাই, এই চারটি আমের দাম ত্রিশ টাকা হবে।
- নিয়ে যাও, তা না হলে এবার সত্যি সত্যি ঝগড়া করব!

আম নিতে হল। রীতার মা ঐ চারটি বড় আম দেখে খুব লজ্জা পেল। পরের দিন সুযোগ পেয়ে বাপ্পার মায়ের কাছে তার গাছের শেষ কাঠালটা নিয়ে গেল। বলল, মাফ করে দাও বুবু। রাগের সময় যা বলি তার কোন মানে হয় না। আমি ভুল করেছি।

- কখনও না বুবু, আমিই ভুল করেছি!
- না তো! সব আমার দোষ!
- সে কি! আমি বলছি, সব দোষ ছিল আমার! আবার ঝগড়া শুরু হচ্ছিল... তখন হঠাৎ তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। তাদের এমন হাসি পেল যে ফুরাতে চায় না...

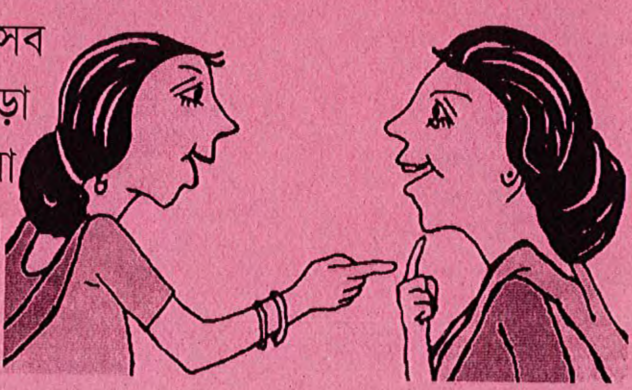

৩৪৯। দুটি ভাই

কুমিল্লা জেলার ঝাউতলা গ্রাম। সেখানে বাস করত ওসমান ও ফারুক, দুই ভাই। তাদের বয়স দশ বছর। তারা জমজ, দেখতে এত সমান যে, বাবা-মা পর্যন্ত তাদের নাম ডাকতে ভুল করে।

তবে এক দিন স্কুল থেকে ফিরে আসার সময় ফারুক এক মস্তানের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। তার ভাইকে রক্ষা করতে গিয়ে ওসমানের কপালে একটা পাথর লাগল। তাতে একটা দাগ পড়ে গেল যা সারা জীবন আর মুছল না। সেই দাগ দেখে সাথিরা তাকে চিনে ফেলত।

এক দিন মা হঠাৎ ডাইরিয়ায় মারা গেল। তখন ফারুক মামার বাড়িতে গিয়ে মানুষ হতে লাগল। সে মামার মত ভাল কাঠমিস্ত্রী হয়ে গেল। ওসমান বাবার সঙ্গে ঢাকায় গেল, সেখানে বাবা বিভিন্ন কাজ করতে লাগল, ছেলেটাও বেঁচে থাকার জন্য এদিক ওদিক ঘুরে সব রকমের কাজ করতে লাগল। এক সময় তিনজন টোকাইয়ের দলে মিশে তাদের সর্দার হয়ে গেল। সুযোগ পেলে তারা কাজ করত, আর না পেলে চুরি করে খেত। এই সব করতে করতে ওসমানের বয়স বিশ বছর হয়ে গেল, ভাইএর সঙ্গে এক বারও তার দেখা হল না। এক দিন ওসমান তার দলের যুবকদের বলল, ভাই সব, আর একটু সাহস না করলে আমাদের কোন উন্নতি হবে না। এই অবস্থায় পড়ে থাকার চেয়ে বড় একটা ঝুকি নেব। যাদের সাহস আছে তারা আমার সঙ্গে থাকো। আমার পরিকল্পনা এই। ঢাকা থেকে রাত্রে একটা ট্রেন চট্টগ্রামে যায়। সেটা রাত একটার দিকে ছোট একটা স্টেশনের সামনে দিয়ে যায়।

সেখানে থামে না, কিনতু এত ধীরে চলে যে ট্রেন থেকে নামতে কষ্ট হয় না। সে সময় সবাই ট্রেনের ভিতরে ঘুমায়। আমরা যদি একটা ব্যাগ নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে যাই তা কেউ জানবে না। ব্যাগ নেওয়ার সময় যদি লোকটি টের পায় লাঠি দিয়ে মাথায় একটা ঘা দিলে সে চুপ করে যাবে! আমরা স্টেশনের কাছাকাছি নামব। সেখানে আমাদের একজন অপেক্ষায় থাকবে, আমরা রাত্রে মাল লুকিয়ে সকালের ট্রেনে উঠে ঢাকায় ফিরে আসব।

ওসমানের কথামত কাজ শুরু হল। তারা এক বার, দুই বার, তিন বার বিভিন্ন ব্যাগ চুরি করে ঢাকায় ফিরে আসল। তবে তারা যত আশা করেছিল তত লাভ হয়নি, ওসমানের ছোট দল ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিল। তখন একদিন অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। ওসমান ট্রেনের সিটের নিচ থেকে একটা ব্যাগ বের করতে গিয়ে পারল না, ব্যাগ ঘুমন্ত লোকটির হাতে বাধাঁ ছিল। লোকটি জেগে উঠল ও ওসমানের মুখে টর্চলাইট মারল। ওসমান তার লাঠি বের করল... তখন লোকটি ওসমানের কপালের দাগ দেখে তাকে চিনতে পারল। নিচু স্বরে বলল, ওসমান থাম! আমি ফারুক!

লাঠিটা ওসমানের হাত থেকে পড়ে গেল । ফারুক তার গলা জড়িয়ে ধরল ও তাকে পাশাপাশি বসিয়ে কাঁদতে লাগল। বলল, ওসমান, তোমার কথা ভেবে আমি দিনে-রাতে দশ বছর কেদেঁছি! চল, আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে ছাড়ব না। সুখে দুঃখে একসঙ্গে থেকে যাব। তোমার আর চুরি করা লাগবে না। এবার আমি যদি বাঁচতে পারি তুমিও বেঁচে যাবে।

৩৫০। রত্নার বাবা

১৯৭১ সাল, জুলাই মাস। মুক্তিবাহিনীর কয়েকটা দল ঢাকার আশে-পাশে পাকিস্তানী সৈন্যদের ট্রাক, জীপ, বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় ও তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে নতুন নতুন দল গঠন করে। এই সব দলের কমান্ডারকে সবাই বাবুল বলে ডাকত। পাকিস্তানী ব্রিগেডিয়ার একদিন তার আসল নাম জানতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ীতে সৈন্যদের পাঠিয়ে তার আঠার বছরের মেয়ে রত্নাকে

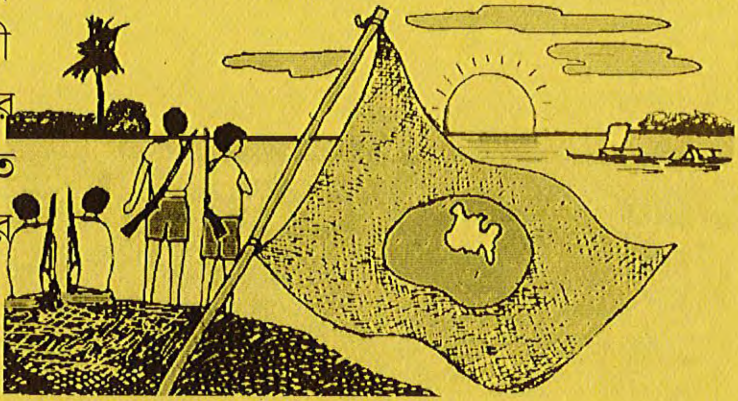

নিয়ে গেল। বলল যে, ওর বাবা এসে যদি ধরা দেয় তবে মেয়েটাকে ছেড়ে দেবে।পরের দিন বাবুল তিনজন মুক্তিবাহিনীর সাথে আলাপ করছিল। পারিচিত এক মাঝি এসে তাকে একটা চিঠি দিল। "পাকিস্তানীরা রত্নাকে নিয়ে গেল। তুমি না গেলে ওরা তাকে ছাড়বে না। আমার সাথে একবার দেখা করে যেও। ইতি রত্নার মা।" বাবুলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট সে পাথরের মত নিস্তেজ হয়ে রইল। শেষে বলল, ভাই সব, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এবার তোমাদের পালা।

- বাবুল, যেও না ভাই, তুমি ছাড়া আমরা পারব না।
- এটা ভুল। আমার মত মানুষ দেশে অনেক আছে... কিন্তু রত্নার বাবা একজন, সে আমি। বাবুল নৌকায় উঠল। রাত্রে বাড়ী এসে রত্নার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিল। সকালে ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছল। ব্রিগেডিয়ার বলল, আমি যে কথা দিয়েছি সে কথা রাখব। আপনি মেয়েটাকে বাসে

উঠিয়ে দিন। এক দল সৈন্য তাদের দুইজনকে রাস্তায় পৌঁছে দিল। রত্না

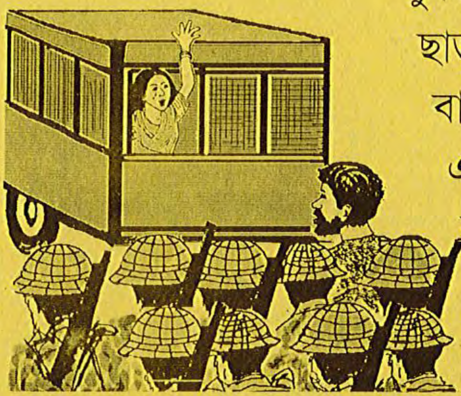

বুঝতে পারল তার পরিনাম কি হবে। বাবাকে ছাড়তে চাচ্ছিল না। বাবা তাকে জোর করে বাসে উঠিয়ে দিয়ে বলল, যদি না ফিরি একদিন তোমার ছলেমেয়েদের আমার কথা বলবে। ফিরে গিয়ে বাবুল ব্রিগেডিয়ারের সামনে দাড়াল।

• আপনি দেশের শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক। আপনার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আপনাকে বাঁচাতে পারি এক শর্তে। যদি দেশের অন্য শত্রুদের নাম ও ঠিকানা বলে দেন, তবে আপনাকে ছেড়ে দেব। বাবুল হেঁসে বলল,

• আপনি কি এ আশা করে আমাকে এনেছেন?

• না, সে আশা আমি করিনি, এই প্রস্তাব করার নিয়ম আমাদের আছে, তাই করলাম। যদি কোন শেষ কথা বলার থাকে বলে যান।

• আপনি আমাকে এভাবে ধরে এনে কাপুরুষের কাজ করেছেন ও মনুষ্যত্বের অপমান করেছেন। আমি তা কোন দিন করতাম না।

. যুদ্ধ এমনি তো মনুষ্যত্বের অপমান।আর কাপুরুষের কাজও বটে,বীরের কাজ নয়। যারা আমাদের চেয়ে দুর্বল, আমরা তাদের মারতে যাই। এমন কাজ আপনারাও করেন আমরাও করি। তবে হ্যাঁ, আজ আমাদের মধ্যে তফাৎ আছে বটে। আপনি জানেন কার জন্য মরতে যাচ্ছেন। আমি কার

জন্য প্রতিদিন মরার ঝুকি নিই,তা আর বুঝতে পারছি না... ব্রিগেডিয়ার দাড়াল। দাড়িয়ে বাবুলকে স্যালুট করল। তারপর দশজন সৈনিক এসে তাকে ট্রাকে উঠিয়ে দিল।দশ মিনিট পরে গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনা গেল।

৩৫১। অপব্যয়ী পুত্র

এক ভদ্র লোকের দুটি ছেলে ছিল । বড়জন ছোটবেলা থেকে খুব শান্ত শিষ্ট, হিসাবী ও বাবা-মায়ের বাধ্য । ছোটজন খুব চঞ্চল, অবাধ্য ও অপব্যায়ী । সবাই তাকে মন্দ বলত তবে তার সুখী স্বভাবের জন্য সবাই তাকে ভালবাসত । কিনতু তার বয়স বিশ বছর হলে একদিন সে বাবাকে বলে বসল, বাবা, আমি বড় ভাইএর সঙ্গে থাকতে পারব না, আমাদের স্বভাব আলাদা, রোজ আমাদের ঝগড়া হয় । তার চেয়ে তুমি যে সম্পদ আমাদের দিতে চাও তা এক্ষুনই ভাগ করে

দাও আর আমরা আলাদা হই । বাবা তার সম্পদ তিন ভাগে ভাগ করে, একটা অংশ রেখে, বাকি দুটি অংশ ছেলেদের দিয়ে দিল । বড় ছেলেটা বলল, বাবা, তুমি বেঁচে থাকতে আমি তোমার সম্পদ নিতে পারব না । এদিকে ছোট ছেলেটা শহরে গিয়ে আনন্দ উল্লাসে তার সম্পদ উড়িয়ে দিতে লাগল । কিনতু দুই বছরের মধ্যে তার সব টাকা শেষ হয়ে গেল, হাতে কিছু রইল না । ঠিক সেই সময় দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হল ।

বেঁচে থাকার জন্য তার মজুরী খাটতে হল, শেষে কোন কাজ না পেয়ে এক চাষীর বাড়িতে পেটে-ভাতে শুওর চড়াতে হল । এক বেলা ভাত । সে খিদের জ্বালায় মরে যাচ্ছিল । তখন বাবার কথা মনে পড়ল । ভাবল, বাড়ি ফিরে গেলে বাবা আমাকে তাড়াবে না । বাবা এই দুই বছর ধরে লোক পাঠিয়ে গোপনে তার সব খবর নিয়েছিল, আর এখন তার দুরাবস্থার কথা

শুনে তার মন কাঁদছিল। এক দিন তার পুরানো চাকরকে ডেকে বলল, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আন। চাকরটি গিয়ে বলল, ফিরে এস, তোমার বাবা প্রতিদিন কাদেঁ। ছেলেটা ফিরে গেল। বাবা তার ঘরের ছাদে বসা ছিল। তার

ছেলে যে পথ দিয়ে চলে গিয়েছিল সেই দিকে চেয়ে ছিল। এখনও ছেলেটা অনেক দূরে, তবু বাবা তাকে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে তার চাকরদের বলল, তাকে গোসল করাও, সুগন্ধি তেল মাখাও, সবচেয়ে সুন্দর পোষাক পরাও। তারপর তাজা গরুটা জবাই করে ভোজের আয়োজন কর। ছেলেটা এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল,বাবা, তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা কর। বাবা বলল, তোমার মুখের হাসি দেখে আমার দুঃখ মুছে গেছে। সবাই আনন্দ উল্লাসে বাজনা বাজিয়ে খাওয়া দাওয়া করতে লাগল। তখন বিকাল পাঁচটা। বড় ছেলে কাজ থেকে ফিরে আসছিল। দূর থেকে বাজনাটা শুনে জিজ্ঞাসা করল, ব্যপারটা কি? লোকেরা বলল, তোমার ছোট ভাই ফিরে এসেছে, তোমার বাবা তাজা গরুটা জবাই করে

ভোজের আয়োজন করেছে। বড় ছেলে ঘরে ঢুকতে চাচ্ছিল না।বাবাকে বলল, আমি সব সময় তোমার বাধ্য ছিলাম,তুমি আমার জন্য কোন দিন একটা ভোজ করনি, আর ওর জন্য তুমি তাজা গরুটা জবাই করেছ? কেন তাকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাস? বাবা তার দিকে অনেক্ষন চেয়ে রইল, শেষে দুঃখের সঙ্গে বলল, খোকা, তুমি কাজ করতে জান, আয় করতে জান, কিনতু হাসতে জাননা।

৩৫২। অপব্যয়ী ব্যবসায়ী

বাগদাদ নামে এক বিরাট শহরে এক খলিফা ছিল। তার একমাত্র কন্যা নূরজাহান। সে খুব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। লেখাপড়া তো জানতই, আর তা ছাড়াও সব রকম হাতের কাজ জানত ও সুন্দর ছবি আঁকতে পারত। একদিন সে একা প্রাসাদের বাইরে বেড়াতে গেল। এক নির্জন জায়গায় এসে দস্যুদের হাতে ধরা পড়ল। তাকে উটের পিঠে চড়িয়ে তারা দামেস্কো নগরের দিকে চলল।

সেই পথ দিয়ে আসছিল এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে, তার নাম সেলিম। সে দামী দামী মাল নিয়ে ব্যবসা করতে আসছিল। সেলিম মেয়েটার চোখে পানি দেখে থেমে গেল। দস্যুরা বলল, ঐ মেয়েটা বাগদাদের খলিফার কন্যা। তার দাম সত্তর লাখ টাকা। সেলিম মেয়েটিকে

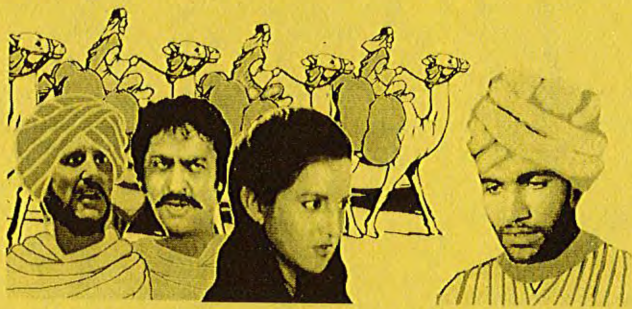

বলল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে ? মেয়েটি বলল, যাব। সেলিম তার সব মালপত্র দস্যুদের হাতে তুলে দিল। মেয়েটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। বাবা অবাক।

- সে কি! দু' দিনের মধ্যে ফিরে এলে! আর ঐ মেয়েটা কে?
- এই মেয়েটি বাগদাদ নগরের রাজকন্যা। দস্যুরা তাকে ধরে নিয়ে আসছিল। তাকে উদ্ধার করার জন্য সমস্ত মাল ছেড়ে দিতে হল।

বাবা রেগে বলল, চলে যাও, আর আমার বাড়িতে পা দিও না!...

সেলিম বেরিয়ে গেল। রাজকন্যার সঙ্গে নদীর তীরে গিয়ে বসল। তার চোখে পানি। হঠাৎ রাজকন্যা বলল, সেলিম, অনেক রাজপুত্র আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, তবে কেউ আমার জন্য নিজের সর্বস্ব ভাসিয়ে দেয়নি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে চাও...?

হ্যাঁ, চাই। নূরজাহান, তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে চাও?
হ্যাঁ, চাই। আজ থেকে আমাদের কপালে যাই থাক না কেন, আমরা তা ভাগ করে নেব। এবার শোন, আমি ছবি আঁকতে পারি। তুমি বাজারে বিক্রি করতে পারলে আমরা বেঁচে যাব।
তারা ছোট একটা ঘর ভাড়া করে ছবি আঁকতে ও বেচতে লাগল। এদিকে খলিফা এক দল সৈনিক পাঠিয়ে নূরজাহানকে খুঁজছিল। একদিন সেনাপতি ছবিগুলো দেখে সেলিমের বাসা খুঁজে পেল।

- রাজকন্যা, সালাম নেবেন। খুব দেরী করে এলাম, আমি দুঃখিত।
- সেনাপতি, আপনি এসেছেন!

বেশ, চলুন, আমরা আপনার সঙ্গে যাই।

- খলিফার হুকুম, রাজকন্যা ছাড়া কাউকে সঙ্গে নিতে পারব না।

তারা সেলিমকে বেঁধে রেখে নূরজাহানকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল। সেলিম একা পড়ে রইল। যখন দড়ি খুলে ঘর থেকে বের হল, তখন এক বুড়ো ফকির তার কাছে ভিক্ষা চাইল। তারপর ব্যাপারটা শুনে বলল, চল, বাগ্দাদে যাই. আমি পথ চিনি, পথে ভিক্ষা করে খাব। সেলিম বলল, তুমি আমার বন্ধু চিরকালের জন্য, চল। কয়েক দিনে তারা রাজবাড়িতে পৌঁছল। সেলিম মালিদের কাছে কাজ করতে লাগল। একদিন তারা রাজকন্যার ঘরে তাকে একটা ফুলদানী যেতে বলল। তাকে পেয়ে মেয়েটির আনন্দ আর ধরে না। তারা পালাবার আয়োজন করছে, এমন সময় ফকির ফিরে এল। এসে বলল, আমি এই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। কন্যাকে চুরি করা লাগবে না, কালকে তোমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান হবে।

৩৫৩। যুদ্ধের দুঃখ

এক দিন মানিক মিয়ার কাছে বার বছরের এক ছেলে এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল "সকাল দশটায় একশটি সেনার দল আসবে। তিন চারটি গ্রামের সর্বনাশ করবে "। মানিক মিয়া তার দশজন যুবককে ডেকে চিঠিটা দেখাল। সকলের মুখে ছায়া পড়ে গেল। তাদের ছিল দুটি ছোট মেশিনগান ও কয়টা বন্দুক। এই নিয়ে একটা সেনাদলের সঙ্গে লড়াই করা বোকামি। শহীদ বলল, ওদের থামাবার উপায় আছে। তবে... ঐ দেখ, সুর্য ডুবে যাচ্ছে... কি সুন্দর! এই অপূর্ব দৃশ্য আমাদের দুই-একজন আর দেখতে পাবে না...। মানিক মিয়া বলল, ওরা এক হাজার ঘর পুড়িয়ে ফেলবে তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু ওরা শুধু ঘর পুড়াবে না, তোমরা জান। ওদের বুঝাতে হবে যে এখানে আসতে হলে প্রাণের মায়া ছেড়ে আসতে হয়...। শহীদ বলতে লাগল, ওরা আসবে বিলের পথে। পথের পাশে হঠাৎ আমার মেশিনগান একটি গর্ত থেকে বের হয়ে গর্জন করে উঠবে এবং মরনের গান গাইতে থাকবে। এর পরেও যদি ওরা এগুতে চায় ওদের সংখ্যা হবে বিশজন কম।

• উজ্জল বলল, না শহীদ! ওদের সংখা হবে চল্লিশজন কম। পথের অপর পাশে আমি থাকব। তোমাকে একা যেতে দেব না শহীদ!

মানিক মিয়ার মন কাদঁছিল। শহীদ তার ভাইয়ের ছেলে। আর উজ্জল তার ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রানভরা হাসি... সবাই তাকে ভালবাসে। মানিক মিয়া বলল, তোমাদের চেয়ে ভাল বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু তোমরা দুজন যাবে কেন? আমরাও তো আছি।

উজ্জল বলল, স্যার, আমার দুটি ভাই আছে। আমি মরে গেলে তারা মাকে সান্তনা দেবে। শহীদ বলল, চাচা, আমার গ্রামে, আমার বাড়িতে ওরা ঢুকবে না, তার চেয়ে প্রাণ যায় যাক!.... মানিক মিয়ার মুখ অন্ধকার হয়ে গেলঃ- কার প্রাণ যাবে বাবা?... প্রাণ দিতে তোমার লাগবে এক মিনিটের দুরন্ত সাহস... সেই প্রাণ গড়তে তোমার মা-বাপের লেগেছে বিশ বছরের কষ্ট, পরিশ্রম, না খেয়ে থাকা... শুধু কি তাই? তুমি মরে গেলে আরও বিশ বছর তাদের কাদঁতে হবে। তারা কাদঁবে যতবার দেখবে তোমার ছবি, তোমার বই, তোমার খেলনা... শোন, তোমরা বাড়ি যাও। তাদের সঙ্গে দেখা কর। যদি তারা ফিরতে দেয় তবে রাত দশটার আগে ফিরে এস... না হলে... তখন সবাই হাত তুলে বলল, আমরা যাব। কিনতু উজ্জ্বল ও শহীদ দশটার আগে ফিরে এল। সকালে যখন পাকিস্তানী সেনাদল দুটি গর্তের কাছে পৌছল তখন হঠাৎ দুটি মেশিনগান গর্জে উঠল। গুলির শব্দ যখন থেমে গেল তখন ত্রিশটা লাশ পথে পড়ে ছিল। বাকি সবাই, দশ মিনিট পরে আহতদের বয়ে নিয়ে চলে গেল। মানিক মিয়া এসে দেখল, চারিদিকে ভয়ানক নিস্তব্দতা। শহীদ ও উঁজ্জল তাদের গর্তে পড়ে আছে। পথের দুই পাশে সাজানো, বত্রিশটি লাশ। রক্তের দুর্গন্ধে তার মাথা ঘুরছিল। হঠাৎ দেখতে পেল, একজন সৈন্যের আঙ্গুল নড়ছে। সে এখনও মরেনি। ছেলেটার বয়স বিশ বছর হবে... তার ছোট ভাইয়ের মত। একা, পরের দেশে, মরে যাচ্ছে। মানিক মিয়া তার হাত ধরল। ছেলেটার ঠোট নড়ল। বললঃ- আম্মা! তারপর নিঃস্বাস তার বন্ধ হয়ে গেল। মানিক মিয়া উঠে দাড়াল। বুকে অসহ্য যন্ত্রনা। ভাবল, এই সব ছেলেরা মরেছে কার জন্য?.... তার যুবকদের বলল, চল, উজ্জল ও শহীদকে বাড়ি নিয়ে যাই...

৩৫৪। কামিনী কৃপণ

চাঁদের দেশে একটা পরী ছিল। তার বয়স অল্প, এখনও তার জ্ঞান-বুদ্ধি পাকেনি। সে ভাবল, ভগবান শুধু মৃত্যুর পরে মানুষকে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়। তার চেয়ে জীবন থাকতে তাদের পুরস্কার দিলে সবাই ভাল হয়ে যেত। কিন্তু... ভাল মানুষ কারা? পরী চিন্তিত হয়ে পড়ল। পরীদের মধ্যে একজন ছিল, তার দুশ বছর বয়স, তাকে জিজ্ঞেস করল, বুবু, ভাল মানুষ কারা? সে উত্তর দিল, কেন, যাদের মুখে হাসি আছে তারাই ভাল। তারা তো আনন্দ ছড়ায়। পরীটি কুজো বুড়ির ছদ্মবেশ ধরে লাঠিতে ভর দিয়ে গ্রামে গ্রামে বেড়াতে লাগল। একটি গ্রামে এসে দেখে, দুটি বিধবার ঘর, যামিনী ও কামিনী। তারা কাপড় বুনে বাঁচে। যামিনীর। মুখে হাসি। মাঝে মাঝে পড়শীরা এসে আড্ডা মারে, পান খায়, গল্প করে, হাসি-তামাশা করে। রাস্তার ওপাশে কামিনী এসব কীর্তি দেখে রাগ করে। বলে, কাজ না করলে পড়শীরা আমাকে খাওয়াবে নাকি ? সে কাউকে পাত্তা দেয় না, ভাত খাওয়ার সময় ডান হাতে ভাত খায় আর বাঁ হাতে তাত চালায়। সেদিন সন্ধ্যায় বুড়িকে তার উঠানে আসতে দেখে কামিনী আরও জোরে তাঁত চালাতে লাগল। বলল, এখানে না বুড়ি, আমার কাজ আছে, গল্প গুজব করতে চাও তো সামনের বাড়িতে যাও।বুড়ি যামিনীর বাড়িতে গেল।

- মা, আমাকে একটু বসতে দেবে? আমি খুব ক্লান্ত।
- বস খালাম্মা!, আমি পান নিয়ে আসি... এই নাও। খালাম্মা, রাত হয়ে গেছে, আজ থেকে যাও। রাতে আমার যা আছে তাই খাবে। বুড়ি বলল, বেশ, আমি তোমার রান্না করে দিই। তারা দু'জনে খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প করতে করতে শুতে গেল। সকালে চলে যাওয়ার সময় বুড়ি বলল, দোয়া করি মা, সকালে যে কাজ শুরু করবে তা যেন সারাদিন দ্রুত চলে। যামিনী সেদিন একটা সুন্দর সৌখিন কাপড় বুনতে বসেছিল। পাঁচ মিনিটে শেষ হয়ে গেল, তারপর দুটো, তিনটে, চারটে, দশটা... এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি! তখন ডাকল, কামিনী বু, বুড়ির কান্ড দেখে যাও! কামিনী বলল, বুড়ি আবার আসলে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। পরের দিন বুড়ি তার কাছে এল। কামিনী বলল, খালাম্মা আসেন, ইলিশ মাছ রান্না করেছি, থেকে যান! কামিনী হাসল, কিনতু তার হাসি বাঁকা ছিল, মানুষ কি ভাবে হাসে তা ভুলে গিয়েছে। বুড়িকে ভাত খেতে দিল, নরম বিছানায় শুতে দিল। সকালে বুড়ি বলল, দোয়া করি মা, তুমি যে কাজ নিয়ে দিন শুরু করবে তা যেন সারাদিন দ্রুত চলে। কামিনী কিন্তু কাজ শুরু করার আগে পায়খানা করতে গেল। তাই সে, বুড়ির কথামত, সারাদিন দ্রুত বেগে পায়খানা করতে লাগল।

৩৫৫। কে চোর নয়?

অনেক দিন আগের কথা। একদিন একটি চোর রাজবাড়ীর রান্নাঘর থেকে চারটি রুটি চুরি করে ধরা পড়ে। সে ও তার ছেলেমেয়ে দু'দিন ধরে কিছু খায়নি। রাজবাড়ীর নিয়ম অনুসারে তার বিচার করে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হল। রাজা বলল, মরবার আগে যদি কোন কথা বলার থাকে বলতে পার। চোরটি কিছুক্ষন চিন্তা করে বলল, মহারাজ, আমি বাবার কাছ থেকে একটা মন্ত্র শিখেছি। তার দ্বারা দেশের অনেক উপকার হতে পারে, তবে আমার কোন লাভ হবেনা বলে আমি তা ব্যবহার করিনি। আমার কয়েকটা ফুলের বীজ আছে। একটা কবরের মাটিতে লাগাতে হবে। আপনি যদি কালকে আপনার পিতার কবরের কাছে সব কর্মচারীদের ডেকে আনেন আমি মরবার আগে সেই বীজের ব্যবহার শিখিয়ে দিতে

পারি। পরের দিন রাজার পিতার কবরের চারদিকে সব রাজকর্মচারীরা এসে হাজির হল। চোরটি প্রত্যেকের হাতে একটা করে বীজ বিলি করে দিল। তারপর বলল, এই বীজ কবরের মাটিতে লাগাতে হবে। এক সপ্তার মধ্যে বীজটা চারা হয়ে ফুল ধরবে। যারা জীবনে কোন চুরি করেনি তারা বেঁচে থাকবে, আর যারা চুরি করেছে তারা ফুল ফোটার

সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে। রাজা তার মন্ত্রীকে বীজ লাগাতে বলল। মন্ত্রী বলল, মহারাজ আমি পারবনা, ছোটবেলায় পাশের বাড়ীতে পেয়ারা চুরি করে খেয়েছি। রাজা বাবুর্চিকে বীজ লাগাতে বলল।

বাবুর্চি হাত জোর করে বলল, মহারাজ আমাকে মাপ করে দিন, আমি বাজার করার সময় টাকার হিসাব বাড়িয়ে দিয়েছি।এবার রাজা রাণীকে বলল, তাহলে তুমি বীজ লাগাও। রাণী রাজার পা ধরে বলল, মহারাজ আমি আপনার পকেট থেকে টাকা চুরি করে হীরার দুল কিনেছি। রাজা এবার রাগ করে বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জীবনে চুরি করেনি? তোমরা এসে বীজ লাগাও। ভয় কিসের?

এক মিনিট গেল, দুই মিনিট গেল,
কেউ নড়ল না।

তখন মন্ত্রী বলল, মহারাজ, আপনি বরং বীজটা নিজেই লাগিয়ে দিন। রাজা ধীরে ধীরে বীজটা হাতে নিল, নেড়ে চেড়ে দেখল, তারপর বীজটা চোরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আমি বিচারে তোমাকে শাস্তি দিয়ে ভুল করেছি, আমরা সবাই চোর। তফাৎ এইটুকু যে, তুমি চুরি করেছ রাজার কাছে। আমরা চুরি করেছি গরীবদের কাছে। তোমার চেয়ে আমাদের দোষ আরও বেশী। আজ থেকে তুমি রাজবাড়ীতে বাবুর্চির কাজ করবে, যেন খাবারের অভাবে তোমাকে আর কোন দিন চুরি করতে না হয়।

৩৫৬। কে চালাক, কে বোকা?

দুটি ভাই ছিল, বড় ভাই খুব চালাক ছোট ভাই খুব সরল। তারা ভোর বেলা কাজ করতে যেত, বিকালে ফিরে এসে মায়ের কাছে টাকা জমা দিত। বড় ভাই সব সময় বেশি টাকা আনত তাই ছোট ভাইকে ঠাট্টা করত। একদিন দুইজনে কাজে যাচ্ছিল, দেখল এক বৃদ্ধ চাষী লাঙ্গল কাঁদে নিয়ে মাঠে যাচ্ছে। লাঙ্গল খুব ভারী, তার খুব কষ্ট হচ্ছে। বড় ভাই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ছোট ভাই বলল, লাঙ্গলটা আমার ঘাড়ে একটু দাও চাচা, আমার কোন অসুবিধা হবেনা। মাঠে পৌঁছে গিয়ে চাষী বলল, বাবা, ফিরে আসার পথে লাঙ্গলটা বয়ে নিতে পারবে? ছেলেটা বলল, পারব না কেন? বিকালে ছেলেটা লাঙ্গলটা চাষীর বাড়ি পৌঁছে দিল। চাষী বলল, এই নাও, এই ছোট গাধা আমার কোন কাজে লাগে না, তুমি নিয়ে যাও। সকালে তার গোবর নেড়ে চেড়ে দেখ, প্রতিদিন তিনটি করে সোনার মুদ্রা পাবে। ছেলেটা গাধায় চড়ে বাড়ীর দিকে চলল। পথে এক ছোট হোটেলে খেতে বসল ও তার গাধার গুনাবলির কথা বলল। মালিক চাকরকে ইশারা করে গাধাটা সরিয়ে নিয়ে অন্য আর একটা গাধা দিল। ছেলেটা বাড়ী গিয়ে তার কাহিনী শুনাল। বড় ভাই হাঁসল, মাও হাসল। সকালে সে গাধার গোবর নেড়ে চেড়ে দেখল, কিছুই পেলনা। সে দিন কাজে যেতে যেতে দুই ভাই দেখল, একটা গরুর গাড়ী গর্তে আটকে

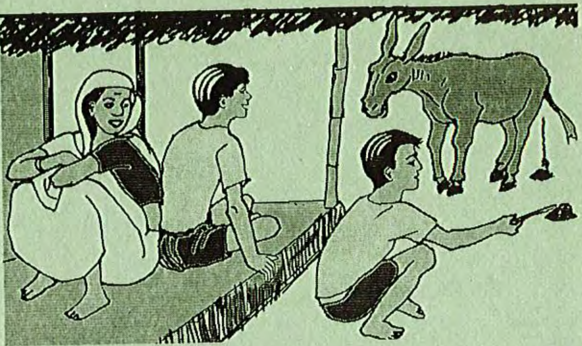

গেছে। বড় ভাই না দেখার ভান করে চলে গেল। ছোট ভাই মালিককে সাহায্য করে গাড়ীটা উঠিয়ে দিল। লোকটি বলল, বড় উপকার করেছ

ভাই, এই নাও, এই রুমাল পেতে দিলে যা খেতে চাও তাই পাবে। বিকালে ফিরবার পথে ছেলেটা আবার সে হোটেলে থামল। মালিক তার জন্য ভাত নিয়ে আসল। ছেলেটা বলল দরকার হবেনা, এই দেখঃ- রুমালটা পেতে দিয়ে বলল, বিরানী খাব। সঙ্গে সঙ্গে এক থালা বিরানী রুমালের উপর পড়ল। খাওয়া দাওয়ার পর মালিক তাকে পাশে ডেকে রুমালের কথা জিজ্ঞাসা করল ও তার চাকরকে ইশারা করল। সে রুমালটার বদলে আর একটা রুমাল দিল। বাড়ী এসে ছেলেটা তার কাহিনী শুনাল। রুমালটা পেতে দিয়ে বলল বিরানী খাব। কিছু হলনা। বড় ভাই হাসল। মাও হাসল। ছোট ভাই দুঃখে অভিমানে কিছু খেল না। শুধু ভাবতে লাগল। সে বুঝতে পারল কে তার ক্ষতি করেছে। পরের দিন কাজ করে ফেরার পথে বুড়ো চাষীর বাড়ীতে গেল ও তার কাহিনী শুনাল। চাষী বলল, এসব আমার ভুল, এই কৌটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, নাও, এর ভিতরে আছে গাধাটার চাবুক। সবাই খুলতে পারে তবে বন্ধ করতে হলে তোমার কথা ছাড়া কারও কথা শুনবে না। ছেলেটা হোটেলে গিয়ে মালিককে বলল, এই কৌটাটা রাখেন, কেউ যেন না খোলে। বলে সে শুইতে গেল। রাত্রে মালিক ও চাকরের চিৎকার শুনতে পেল। চাবুকটা তাদের গায়ে পড়ছিল। তারা এঘরে ওঘরে দৌড়াচ্ছে, খাটের তলে লুকাচ্ছে, চাবুক তাদের ছাড়েনা।তারা বলতে থাকে, ভাই দোহাই তোমার, চাবুকটা থামিয়ে দাও, আমরা সব ফিরিয়ে দিচ্ছি!

ছেলেটা ধিরে ধিরে নেমে এল এবং চাবুকটা থামিয়ে দিল। তারপর নিজের কৌটা ও রুমালটা নিয়ে, নিজের গাধার পিঠে চড়ে, বাড়ী গেল। তখন বড় ভাই বুঝল, পরের উপকার করলে লোকসান হয় না।

৩৫৭। মানুষের জাত

আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীস দেশে এক রাজা ছিল। সে তার শক্তিশালী বন্ধুদের নিয়ে রাজত্ব করত ও তাদের সম্পদ বাড়ানার জন্য দেশের মানুষকে শোষন করত। কেউ প্রতিবাদ করলে বেশীদিন বাঁচতে পারত না। মাত্র একজন লোক রাজার নিন্দা করতে লাগল। তার নাম ইলিয়াস, রাজ্যের সেনাপতি। ইলিয়াসের এক বন্ধু ছিল, তার নাম মীর্জা। একদিন সন্ধ্যায় সে তার কাছে এসে বলল, ইলিয়াস, পোষাক পরছ কেন? ইলিয়াস বলল, রাজার কাছে যাচ্ছি মীর্জা। আমি জানতে চাই, একটা মানুষ স্বাধীনভাবে এই দেশে বাঁচতে পারে কিনা।

মীর্জা বলল, এই দেশে বেঁচে থাকতে হলে মাথা নীচু করে রাজার অত্যাচার সইতে হবে। শুনে এলাম কাল সকালে তোমাকে গ্রেফতার করা হবে। তোমাকে পালাতে হবে।

- মীর্জা, সারা দেশের মানুষ যখন বিপন্ন, তুমি সেনাপতি হলে কি পালিয়ে যেতে?

- ইলিয়াস... আমি চাই না তুমি মরে যাও!
- যদি মরে যাই, তুমি সবাইকে জানাবে যে, এই দেশে ইলিয়াস নামে একটি মানুষ ছিল। সবাই যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে সেজন্য প্রান দিল। তখন তারা রুখে দাড়াবে। ইলিয়াস রাজার কাছে গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করল,
- সেনাপতি, তুমি না কি রাজার নিন্দা

করে বেড়াও?

• হ্যাঁ মহারাজ, যে রাজ্যে কেউ সত্য কথা বলতে সাহস করে না সে রাজ্য বেশীদিন টেকে না। এই দেশে সবাই প্রাণের ভয়ে কাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে। এমন দেশে বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল।

• বেশ। মরতে যখন চাও তখন মরবে। প্রহরীরা, ওকে তলোয়ার পোষাক খুলে নিয়ে বন্দী করে রাখ, পরে ওর মৃত্যুর দিন ধার্য্য করব।

মীর্জা খবরটি পাওয়া মাত্রই জেলখানায় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

• ইলিয়াস, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?

• রাজার কাছে আমার জন্য এক মাস সময় চেয়ে নাও। আমি দেশে ফিরে গিয়ে মা ও বোনের জীবিকার ব্যবস্থা করে আসব।

মীর্জার অনুরোধ শুনে রাজা বলল, বেশ, তবে তুমি জেলখানায় থাকবে। যদি সে ফিরে না আসে তোমাকেই মরতে হবে।

• আচ্ছা, তাই হবে।

ইলিয়াস মা-বোনের কাছে চলে গেল। ত্রিশ দিন পার হয়ে গেল। ত্রিশ দিনের দিন রাজা মীর্জাকে ডেকে ঠাট্টা করতে লাগল।

• তুমি এত বোকা কি করে হলে, যুবক ?

• মহারাজ, আমি বোকা নই। ইলিয়াস যদি না ফেরে অবশ্যই তার কারণ আছে। তবে বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে আমার কোন দুঃখ নেই।

জল্লাদ তার কাজ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় আধ মরা অবস্থায় ইলিয়াস এসে হাজির হল। রাজা অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। শেষে বলল, এদের ছেড়ে দাও... এই জাতের মানুষ যে আমার রাজ্যে আছে, আমি আগে তা জানতাম না।

৩৫৮। মীরা বড় হয়ে গেছে

মীরার মত অলস মেয়ে জগতে নেই। সকালে দশ বার ডাকলে তারপর বিছানা থেকে উঠবে। মায়ের কাজ বসে বসে দেখে, তাকে সাহায্য করার চিন্তাও তার মাথায় আসে না। এক দিন কিনতু তার এই দশ বছর ধরে যা কোন দিন দেখেনি তা ঘটে গেল। নেচে নেচে স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখল তার দুটি ভাইবোন বারান্দায় বসে বসে কাদঁছে। ঘরে এসে দেখে মা শুয়ে রয়েছে, তার গায়ে খুব জ্বর। মা বলল, তোমার সব কাজ করতে হবে, আমার শরীর খুব খারাপ।

মীরা এক মিনিট চুপ করে রইল, তারপরে বারান্দায় উঠে তার ভাইবোনকে ধমক দিল। কেঁদ না বলছি, আমি আছি। রফিক, তুমি সেলীর মাকে গিয়ে বল এখানে আসতে। মীরা রান্নাঘরে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ভাত চাপাল, তরকারী কুটল, রান্না সারল। তারপরে সেলীর মাকে ডাক্তার আনতে পাঠাল, ভাইবোনকে ও বাবাকে ভাত খাওয়াল, মাকে ওষুধ খাওয়াল, নিজে ভাত খেল, ছোট বোনকে শুইয়ে দিল। শেষে ভাইকে স্কুলের পড়া দেখাল, নিজের পড়া দেখল, তারপর শুতে গেল। সকালে কিনতু বাবা ভোরে কাজে যাবে। মীরা তারাহুরা করে উঠে রান্না শেষ করতে পারল না। বাবা গজগজ করে না খেয়ে চলে গেল। মীরার চোখে পানি আসল। এর পরে ভাইবোনকে খেতে দিয়ে, মাকে ওষুধ খাওয়াতে তার দেরী হয়ে গেল। স্কুলে এসে দেখে, খাতা আনতে ভুলে গেছে। আপা তাকে কলে গিয়ে হাত মুখ ধুতে বলল, সে লজ্জায় মরে যায় আর কি! সেদিন বাড়ি যেতে যেতে মীরা বলল, আমি

সংসারের কাজ করতে পারি কি না, ওদের দেখাব! পরের দিন এক ঘন্টা আগে উঠল, বাবা যখন জাগল তার আগে ভাত রান্না হয়ে গেছে। তারপর ধীরে সুস্থে সমস্ত কাজ সেরে, সেজে গুজে স্কুলে গেল। এই ভাবে আরও ছয় দিন গেল।এক দিন আপা জিজ্ঞেস করল, তোমার মার অসুখ সেরে গেছে?

- না, এখনও শুয়ে আছে।
- কে তোমাদের রান্না করে দেয়?
- কেন? আমি রান্না করি। আর আমি ভাইবোনকে দেখি, মাকেও দেখি।
- তুমি একা একা এই সব পার মীরা?
- পারব না কেন? আমার দশ বছর বয়স হয়েছে আপা।
- ধিরে ধিরে মা সুস্থ হয়ে গেল। তখন এক সময় মীরাকে ডাকল। আচ্ছা মা, চাউল হাড়িতে দেওয়ার আগে ভাল করে ধুতে হয়, জানিস?
- বাঃ এ কথা কি আর বলতে হয়? আমি কি বোকা?
- আর মাছ তরকারী কুটতে গিয়ে কি ভাবে বটি ধরতে হয় জানিস?
- ও মা! আমি কি বটি ধরা শিখতে তোমার জন্য বসে আছি?
- তেল, লবন, মরিচ, কতটুকু লাগে তা কি করে আন্দাজ করিস?
- সে সব আমি কবে শিখেছি! তুমি জিজ্ঞেস করছ কেন?
- করব না? এতদিন এ সব কাজ করনি কেন?
- আগে তো কোন দিন তোমার অসুখ হয় নি। তোমার অসুখ হবে আমি জানতাম না। মা হেসে বাবাকে ডাকে।

- দেখলে তো? তোমার মেয়ে সবই পারে। বাবাও হেসে বলে, আমার মেয়ে তো! পারবে না কেন? মীরার বুক গর্বে ফুলে ওঠে।

৩৫৯। চুরির সাক্ষী

আলী তার পাঁচ বছরের ছেলের বায়না সামলাতে না পেরে তাকে সঙ্গে করে পেয়ারার বাগান দেখতে নিয়ে গেল। দুঃখের বিষয়, খাওয়ার মত কোন গাছে পেয়ারা দেখল না। সবগুলো এখনও এত কাঁচা যে দাঁত বসানো যায় না। মন মরা হয়ে বাপ বেটা দুজনে ফিরে আসছিল, এমন সময় ছেলেটা হাত বাড়িয়ে আর একটা বাগান দেখাল,

- দেখ দেখ বাবা কি সুন্দর পেয়ারা!
- তাই তো! এই বাগানের পেয়ারা যে ভিন্ন! আগেই পেকে যায়! অসুবিধা এই যে, বাগানটা আমাদের নয়, এটা হোসেন সাহেবের। এই গাছগুলো সে খুব কষ্টে লাগিয়েছে, তার দুইটি ছেলে আছে, তারাও পেয়ারা খেতে ভালবাসে... আচ্ছা, তুমি এখানে দাড়াও, আমি দেখে আসি পেয়ারা পেকেছে কি না ? তুমি লক্ষ্য রেখ, কেউ যেন না দেখে।

এই বলে আলি বাগানের ভিতরে গেল। ভিতরে কেউ নেই। থামল একটা সুন্দর গাছের তলে। পেয়ারা খুব নিচু, এক লাফ দিলে ধরা যায়। ছেলেটার জন্য একটা নিলে কি আর হবে...

কিন্তু যেই লাফ দিতে যায় তার কানে এল ছেলেটার চিকন সুর,

- না বাবা, না! তিনি দেখতেছেন!

বাবা সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দিকে ফিরে এল। এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখল... কেউ নেই। জিজ্ঞাসা করল, কই আব্বু...? কে দেখতেছে ?

- কেন আব্বু...? কালকে রসগোল্লা দুই ভাগ করে আমি নিজেরটা খেয়ে বুবুর অংশটা চুরি করে খাচ্ছিলাম, তুমি বললে, কেউ না দেখলেও আল্লাহ দেখতেছেন, দুঃখ পাবেন। আমিও ভাবলাম, আল্লাহ তোমাকেও দেখতেছেন, দুঃখ পাবেন।